পুষ্পমঞ্জরী।

ফল কারণ ফুলৈ বনরায়।
ফল লাগৈ পুর ফুল সুখায়॥
—কবির।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

প্রকাশক

শ্রীনিখিলকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

চিম্পও, ব্রহ্মদেশ।

মূল্য একটাকা।

ফুলের মতো কোমল করে
দিলাম আমার ফুলের কুঁড়ি।

রবীন্দ্র।

নিবেদন

সুপ্রসিদ্ধ প্রবাসী, প্রতিভা, সুপ্রভাত, ভারত-মহিলা, আর্য্যাবর্ত্ত এবং ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি একত্র সংবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইল। ইহার অধিকাংশ গল্পগুলিই আমার লাহোরে অবস্থান কালে লিখিত। আমি এই গল্পগুলি পুস্তকাকারে রচিত করিয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব, সে ভরসা আমার কিছুমাত্র ছিল না। প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম. এ, প্রতিভা সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, সুপ্রভাত সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু সরস্বতী বি. এ, ভারত মহিলা সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরযূবালা দত্ত, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম. এ, ও আর্য্যাবর্ত্ত সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহোদয়গণ তাঁহাদের স্ব স্ব পত্রিকায় গল্পগুলি স্থান দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞ। প্রবাসের সুদীর্ঘ দিনগুলি যাঁহার অমৃত ভালবাসার অতৃপ্ত স্মৃতি বহন করিয়া রাখিয়াছে, আমার সেই সোদরপ্রতিম প্রবাস সুহৃদ শ্রীযুক্ত নিখিলকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় আমার এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইল তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বাণীবিহার,
ভাটপাড়া।   }   গ্রন্থকার।

সূচিপত্র

পুষ্পমঞ্জরী

রূপ ও অরূপ

তিনি ছিলেন—কবি, ভাবুক ও শিল্পী; কল্পনায় তিনি যাহা পাইতেন, ভাবে তাহাকে রসমণ্ডিত করিতেন এবং চিত্রে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতেন, এতদপেক্ষা অধিক কিছু তিনি গ্রহণ করিতেন, সেটী ছিল—তাঁহার প্রাণের আনন্দ। প্রকৃতি-তত্ত্ব-নিলয়ে তাঁহার বুদ্ধি অসাধারণ কার্য্যকারী ছিল। তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের উপাসক, নানা ভাবের, নানা রসের বিচিত্র সঙ্গী! ফুলের সুবাস-স্পর্শ, প্রজাপতির বিচিত্র পক্ষ-সৌন্দর্য্য, সাগরের কল-হিল্লোল, অনিলের স্নিগ্ধ কর-পল্লব ও রবির স্বর্ণ-আভা তাঁহার সোনালী হৃদয়-হ্রদটী নানা বিচিত্র বেদনার রসে উদ্বেলিত করিত, এবং তিনি সকলের মধ্যে একটা সতেজ আনন্দপূর্ণ প্রাণ অতি নিগূঢ় ভাবে অনুভব করিতেন। তাঁহার এ ভাব-সম্পদ তিনি নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ রাখিতেন না,—তাঁহার গানে, কাব্যে, বিচিত্র ছন্দে দেশের বহুসংখ্যক লোক তাহার অংশ লইত।

তাঁহার উপবনের সম্মুখে কলস্বনা যে নদীটী বহিয়া যাইত, তাহার গান-মুখর উর্ম্মিগুলি আনন্দের প্রতিবিম্ব রূপে কত সুদূর দেশের

সংবাদ বহিয়া আনিয়া উপকূলের কূলে কূলে উপহার দিয়া চঞ্চল পদ-বিন্যাসে সাগরের অতল আনন্দে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে ছুটিত। তীরে সলিলোত্থিত সোপানাবলী-পরিমণ্ডিত সুন্দর পুষ্প-উপবনটী কবির স্বীয় আবাস-বাটিকা, নাম—অমরা। অমরার সুবিন্যস্ত বৃক্ষরাজী, পুষ্পবীথি ও লতাকুঞ্জের তলে তলে ক্ষীণ সলিল-রেখা সুবঙ্কিম পথগুলির পার্শ্বচর রূপে সমস্ত উপবনটী ঘিরিয়া রহিয়াছে। নানা বর্ণ-গন্ধ-বিলাসের দ্বন্দ-বিহীন-সুষমাজড়িত সুবৃহৎ পুষ্পগুচ্ছ প্রতিম সমগ্র উপবনটী যেন একটী পেলব মুগ্ধ স্বপ্নের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি!

উপবন হইতে ক্রম-বিন্যস্ত সোপান-রেখা নদীর স্বচ্ছ জলে অব-গাহনে নামিয়াছে; ঊর্ম্মিগুলি কোন্ অজানা দেশের অজ্ঞাত কাকলী তাহাতে বারম্বার লিখিয়া দিতেছিল! সোপানে বাঁধা একটী ক্ষুদ্র তরণী তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া প্রাণের কোন্ আকাঙ্ক্ষাকে যেন প্রকাশ করিতেছিল!

কবি ফুল বড় ভালবাসিতেন; ফুলের সম্বন্ধে তিনি অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন; এজন্য দেশের লোক তাঁহার এক নামকরণ করিয়াছিল,—পুষ্পকবি। পুষ্পকবি সর্ব্বদা ফুলের মধ্যে বিচরণ করিতেন, ফুলের মালা গাঁথিতেন, রাশিকৃত ফুল লইয়া আপনার গৃহাদি সজ্জিত করিতেন ও ফুলবাগানে বসিয়া ফুলের রসভরা বক্ষের উপর প্রজাপতির নৃত্য দেখিতেন।

একদিন কবি ফুলবাগানে বসিয়া ভাবে বিভোর আছেন, এমন সময় একটী তরুণী মুখখানিতে উষার বিমল আভা এবং ঈষৎস্ফুট পদ্ম-কোরকের মতো একটী করুণ ভাব লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তরুণীর কণ্ঠে বীণার প্রথম ঝঙ্কার যেন বাজিয়া উঠিল,—"পুষ্পকবি!"

সঙ্গীতের ধ্বনি সম্পূর্ণ নীরব না হইতেই বিস্ময়-মুগ্ধ কবি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—সমস্ত কুলের পুরোভাগে যেন উষার জীবন্ত লাবণ্য-মহিমা!

বিস্ময়-মুগ্ধ কবি প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুমি?" তরুণী উত্তর করিল,—"আমি দরিদ্র, আপনার সেবা প্রয়াসী। উচ্চ বংশ-গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়াও দরিদ্রতা নিবন্ধন এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, বিশেষতঃ জানি, আপনি গুণবান্ ও মহৎ।"

কবি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম।"

তরুণী হাজার রকমের 'পিয়ণী' ফুল লইয়া মালা গাঁথিত, চন্দ্র-মল্লিকা ফুলের তোড়া গুচ্ছিত করিত এবং কীট বাছিয়া ফুলের মধু ও প্রাণের আনন্দ কবিকে প্রদান করিত।

কবি অপরিসীম আনন্দের মধ্যে সর্ব্বদাই মগ্ন থাকিতেন। আনন্দের সঙ্গে ভোগের ক্ষুধা কি করিয়া মথিত মাদক-ফেনার মতো তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ছাপাইয়া পড়িল, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার আনন্দময় জীবনের নিস্ফলতা ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছিল। ভোগের দ্বারা যে তৃপ্তি, সহজেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়;—বিফলতার মর্ম্মবেদনাই তাহার অন্তিম প্রাপ্তি। তিনি আত্মতৃপ্তির মধ্যে ডুবিয়া নিখিল আনন্দের অমরত্ব হইতে ক্রমেই বঞ্চিত হইতেছিলেন। উন্মাদ রসে যে অচেতন হয়, আত্মহিত চেষ্টা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

তরুণীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া কবি তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন, এবং উক্ত কার্য্য সম্পন্নের জন্য একজন শুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম-যাজককে স্বীয় আলয়ে নিমন্ত্রণ করিলেন

ধর্ম্মযাজক আসিলেন, তাঁহার শুভ্র শান্ত মহিমা বনবীথি ও পুষ্পদলের সৌন্দর্য্যকে যেন ম্লান করিয়া ফেলিল।

কবি তরুণীকে আবশ্যকীয় পুষ্পদল সহ বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য বারম্বার আহ্বান করিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। তিনি তাহার অনুসন্ধানার্থ বাহিরে আসিলেন, কিন্তু নানা স্থান খুঁজিয়াও তরুণীকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে বারম্বার আহ্বানের পর তরুণীর একটা অস্পষ্ট ছায়া-মূর্ত্তি গৃহের বহির্দ্বারের পার্শ্বে দেখিতে পাইয়া কবি দ্রুত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন,—"কবি, আমি এতদিন আপনার নিকট ছিলাম, আজ চলিলাম। ধর্ম্মপ্রাণ পরহিতব্রতী ভোগলিপ্সাহীন ধর্ম্মযাজকের সম্মুখবর্ত্তী হওয়া আমার অসাধ্য! আপনি যে ফুল ভালবাসেন, আমি সেই ফুলের প্রাণ,—পুষ্পরাণী; নিখিল আনন্দের মর্ম্মের মাঝখানে আমার বাস, আমাকে পাইতে হইবে প্রাণের উত্তপ্ত কামনার উপসংহার করুন। ভোগের মধ্যে না করিয়া যোগের মধ্যে অনুসন্ধান করুন, ক্ষমা চাই, আজ বিদায়।"

ছায়া মিলাইয়া গেল। কবি ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মযাজকের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন।

ধর্ম্মযাজকের উপদেশ সাধন ও শুদ্ধ প্রেমমন্ত্রে কিছু দিনের মধ্যে কবির নয়নের কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন,—স্বর্ণ,—বিশ্বরাজ্যের অমৃত ছবি, বিশ্ব আনন্দের মিলন গ্রন্থি, শান্তির মহা পারাবার—ভাষা হারাণ ভাব ডুবান অতল জলধি! তখনি অনাহত শব্দসুর কবির প্রাণের মধ্যে বাজিয়া উঠিল;

রূপ ও অরূপ।

চন্দা ঝলকৈ য়হি ঘট মাহী
অন্ধী আঁখন সুঝৈ নাহী।
য়হি ঘট চন্দা য়হি ঘট সূর,
য়হি ঘট বাজৈ অনহদ তুর॥

এই দেহের মধ্যে চন্দ্র দীপ্যমান—অন্ধ চক্ষু তাহা দেখিতে পাইতেছে না। এই দেহের মধ্যেই চন্দ্র, এই দেহের মধ্যেই সূর্য্য এবং এই দেহের মধ্য হইতে অনাহত শব্দ-সঙ্গীত বাজিতেছে।

ধরণ অকাস গগন কুছ নাহি
নহী চন্দ্র নহী তারা।
সত্ত ধরম কী মহতাবে
সাহব কে দরবারা॥

ধরণী, আকাশ, গগন কিছুই সেখানে নাই; না আছে সেখানে চন্দ্র, না আছে সেখানে তারা;—সেই প্রভুর দরবার সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিতে দেদীপ্যমান।

সুন্ন মহল মেঁ নৌবত বাজে,
মৃদঙ্গ বীণ সেতারা।
বিন বাদর জঁহ বিজলী চমকৈ,
বিন্ সূরজ উঁজিয়ারা।
বিন নৈন জঁহ মোতি পোঁছেঁ
বিন্ শব্দ সুর উচারা॥

সেই শূন্য মহলে নহবত বাজে। মৃদঙ্গ, বীণা, সেতার সেখানে বাজিতেছে। মেঘ বিনা সেখানে বিদ্যুৎ চমকিত হয়, সূর্য্য বিনা প্রকাশিত সেই ধাম।

যাঁহা চন্দ সুরজ নহি ভাওবে,
দুখতাপ নহি পাঁওবে,
যাঁহা নহি জমিন আসমান।

সেই প্রেমের দেশে চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশিত হয় না। দুঃখতাপ কিছুই সেখানে নাই। সেখানে আকাশ পৃথ্বীও অগোচর।

সেই অবধি কবির গানে, কাব্যে ও ছন্দে এক অপূর্ব্বতা পরিব্যক্ত হইত। কোন্ অচিন্ত্য আনন্দের আভাস জাগিয়া উঠিত। কোন্ বিরাট রাজ্যের দ্বারদেশ তাহা দ্বারা মুক্ত হইত।

যে বুঝিত সে বলিত, কি আশ্চর্য্য সম্পদ! কবে দেখিব—কবে পাইব! যে বুঝিত না, সে বলিত, কবির কাব্যে কিছু বোঝা যায় না, সব অব্যক্ত, অস্ফুট, প্রহেলিকা জড়িত—মিথ্যা, আজগুবী স্বপ্ন!

কিছুদিন পরে কবি সোপানাবদ্ধ স্বীয় তরণী খানির বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাতে গিয়া বসিলেন। মহাসাগরের স্রোতের দিকে মহাসঙ্গীতের সঙ্গে সুর বাঁধিয়া তরণীখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

বহু শতাব্দী পরেও মহাকবির কণ্ঠসঙ্গীত আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিত।

লাহোর

২রা চৈত্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

জোনাকী-আলোকে

সেদিন গ্রীষ্মের কালো সন্ধ্যা,—চন্দ্রহীন, বায়ুপ্রবাহ বিহীন; তখন জাপানে জোনাকী ধরার উৎসব,—চারিদিকে আনন্দ কোলাহল। জোনাকী প্রেমের জীবন্ত আলোক!

সে বহু বৎসর পূর্ব্বে একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যার আঁধারে অসংখ্য জোনাকী বহির্গত হইয়া উজি নদীর মসৃণ শীতল জলে ও নদী-তীরস্থ দেবদারু বৃক্ষের পত্রে পত্রে সুবর্ণ-পুচ্ছের হরিতাভ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। নানা কারুকার্য্য-বিচিত্র সুসজ্জিত প্রমোদ-তরণীগুলি নদীজলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল;—তাহার মধ্যে একটী তরণীতে বসিয়াছিল কিওতো নগরের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী তরুণী আশগাও; জোনাকী-প্রদীপের স্নিগ্ধ মৃদু আলোকে তাহার সুন্দর মুখখানি আরো সুন্দর দেখাইতেছিল! সে মুগ্ধের মতো হইয়া জোনাকী-আলোক ও আলোক মাখা নদীজলের রজত-কান্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় একখানি সুসজ্জিত তরণী তাহার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। আশগাও স্নিগ্ধ নয়ন-পল্লব তুলিয়া দেখিল, সুন্দর নবীন যুবক আশজিরোকে,—তৎসাময়িক সামুরাই বংশের উজ্জ্বল রত্ন আশজিরো নৌকার আরোহী। দুইটী নৌকা পরস্পর অতিক্রমনের সময় আশগাও আশজিরোর বীর পুরুষোচিত উন্নত মূর্ত্তির দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল। চারিদিক হইতে সান্ধ্যমদির আকাশ বিচিত্র প্রেমসঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে মুগ্ধ দু'টী আত্মার আত্মবিনিময় মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হইয়া গেল। আশজিরোও আশগাওর দিব্য অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিল। উভয়েই উভয়ের প্রতি এক মুহূর্ত্তে প্রেমে আকৃষ্ট

হইল, এবং দুটী নৌকা পরস্পর অতিক্রমনের সময় দুই জনেই হস্তস্থিত পাখায় প্রেমপত্র অঙ্কিত করিয়া পরস্পর বিনিময় করিয়া গেল। দু'জনার হৃদয় ভরিয়া একই সুর, একই সঙ্গীত বাজিতেছিল,—

"সবি দিনু চরণে তুঁহারি।"

তারপর প্রত্যহই আশগাও সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জোনাকী-উৎসব দেখিতে আগমন করিত, প্রত্যহই আশগাও আশা করিত, সেই দিনের নবীন যুবার সহিত আজ পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু প্রত্যহই বিফলমনোরথ হইয়া আশগাও সকলের শেষে গৃহে ফিরিয়া আসিত। আশজিরো তৎপর দিবসই সেই নগরী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রভুর সাহায্যার্থ যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, কাজেই আশগাও বহু অনুসন্ধান করিয়াও আশজিরোর কোন সংবাদ বা পরিচয় অবগত হইতে পারিল না।

জোনাকী ধরা উৎসব ফুরাইয়া গেল, তবু আশগাওর উজি নদীর সেইস্থানে নৌকা-পরিভ্রমণ ক্ষান্ত হইল না; দিনের পর দিন, মাসের পর বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু আশজিরোর পরিচয় তাহার নিকট পূর্ব্ববৎ অজ্ঞাতই রহিল।

আশগাও সেই দিনের সন্ধ্যার স্মৃতি বুকে করিয়া কাঁদিত; কোন প্রকার আমোদেই তাহার আর মন বসিল না; রাজভোগ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সকলি তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল, সে আর এই প্রকার নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। আশজিরোর অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে খুঁজিয়া বেড়াইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভের জন্য "কোতো"বাদিনীরূপে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিক ও পল্লী-সরাইবাসীদের নিকট 'কোতো' বাজাইয়া প্রাপ্ত অর্থে কোন প্রকারে তাহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

বহু জোনাকী-উৎসব অতীতের মধ্যে ডুবিয়া গেল। কত সুন্দর তরুণ তরুণীর দৃষ্টি বিনিময়ে হৃদয় বিনিময় হইয়া গেল। কিন্তু আশগাও পূর্ব্ব প্রেমেরই একনিষ্ঠ সেবিকা রহিল, এবং এক মাত্র আঁশজিরোর অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

পথিক ও পল্লী-সরাইবাসীদের নিকট 'কোতো' বাজাইয়া আশগাওর দুঃখপূর্ণ জীবন অতি কষ্টে ও গভীর নৈরাশ্যে ক্লিষ্ট ও ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বহু বৎসর সে বহুদেশ পরিভ্রমণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপ গেল, যৌবন গেল, আশগাও বৃদ্ধ ও স্থবির হইয়া পড়িল। অবিরাম ক্রন্দনে তাহার চক্ষু দু'টীও অন্ধ হইয়া গেল।

একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় 'ওয়াইগাওয়ার' সন্নিকটবর্ত্তী একটী সরাইয়ে বসিয়া আশগাও 'কোতো' বাজাইতেছিল। চন্দ্রহীন রাত্রি। বালকেরা সরাইয়ের চতুর্দ্দিকে জোনাকী ধরার জন্য কোলাহল করিতেছে। যদিও সে স্থান উজি নদী হইতে বহু দূরে, তবু আশগাওর অন্তরে অতীত স্মৃতি উজ্জ্বল আলোকে ভাসিয়া উঠিল। সে 'কোতো' যন্ত্রখানি বুকে লইয়া সেই অতীত যৌবনের সন্ধ্যাকালে যুবক যুবতীরা নদীজলে তরণী ভাসাইয়া জোনাকীর যে গানটী গাহিয়াছিল, সেই গানটী গাইতে লাগিল। সেই গানের সুরের ভিতর হইতে আশগাওর হৃদয়ের সমস্ত প্রেম যেন উছলিয়া উঠিতেছিল। সেই গানের সুরে সুরে কত আনন্দ, কত স্মৃতি, কত বেদনা উৎসারিত হইয়া তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল!

এই গানের সুর সেই সরাইয়ের একজন আগন্তুকের মনে সুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখের

সামনের সমস্ত ছবি মুছিয়া গিয়া কোন্ মায়ামন্ত্রে সেই উজি নদী, সেই প্রেমোজ্জল সন্ধ্যা, সেই গান, একখানি সরম-কম্পিত হস্তের সঙ্কোচ-কাতর প্রেমপত্র, আর একখানি সুন্দর মধুময় মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই ব্যথিত, এই ক্ষুদ্র সরাইয়ে ক্ষণকাল আত্ম-বিস্মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিল।— সে আশজিরো।

আশজিরো অগ্রসর হইয়া কোতোবাদিনী অন্ধ বৃদ্ধানারীকে আশগাও বলিয়া চিনিতে পারিল, তাহার চক্ষুদিয়া অবিরলধারে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল, এবং আত্মপরিচয় গোপন করিবার অভিপ্রায়ে নিরুদ্ধ বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আশজিরো বৃদ্ধাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওগো, কেন তুমি এমন পরিত্যক্তা কোতোবাদিনীরূপে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াও?

তখন আশগাও 'কোতো' খানি লইয়া তাহার প্রেমের কথা, প্রেমের জন্য পরিভ্রমণ, সেই প্রেমে সমস্ত আত্মবিসর্জ্জন ও একাগ্র প্রেমনিষ্ঠার কথা—অশ্রুজলে হৃদয় ভাসাইয়া গাইতে লাগিল। গান শেষ হইলে সে অসহ্য যন্ত্রণায় আকুল হইয়া মাটিতে লুটাইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে জানিতেও পারিল না, যে প্রেমের জন্য তাহার এই জীবন ব্যাপী কঠোর দুঃখ ও আত্মবিসর্জ্জন, আজ তাহারই সেই প্রেমাস্পদের সম্মুখে বসিয়া সে সমগ্র হৃদয়ের প্রেমকাহিনী পরিব্যক্ত করিতেছে।

আশজিরো মনে করিল, তখনই আত্মপরিচয় খুলিয়া বলে, কিন্তু বেদনায় তাহার কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা চক্ষে দেখিতে পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ সরাইয়ের দাসীর নিকট বৃদ্ধার জন্য এক তোড়া মুদ্রা ও সামান্য আত্মপরিচয় রাখিয়া প্রস্থান করিল।

জঙ্গলের স্রোতে পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে
জোনাকী আলোকে
১২ পৃষ্ঠা

যখন দাসী এই অর্থ আশগাওকে দিল, এবং সেই ক্ষুদ্র লিপিখানি পড়িয়া শুনাইল, তখন সে বিস্ময় ও নৈরাশ্যে ক্ষণকাল অচৈতন্য হইয়া রহিল। সে চৈতন্য পাইয়াই কোতোখানি পিঠে ফেলিল এবং আশজিরোর অনুসন্ধানে দ্রুত বহির্গত হইল। আশগাও পথে প্রত্যেক পথিককে জিজ্ঞাসা করে,—দ্রুতগামী কোন একটী লোককে যাইতে দেখিয়াছে কি না, এবং যতদূর সম্ভব আশজিরোর চেহারার বর্ণনা করে।

এই ভাবে সে সমস্ত দিন চলিয়া রাত্রিতে ওয়াইগাওয়া নদীর খেয়া ঘাটে উপস্থিত হইয়া জানিল, এইমাত্র আশজিরো নৌকায় চড়িয়া নদী উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে, কয়েক ঘণ্টা ছাড়া দ্বিতীয় কোন খেয়া নাই, কাজেই এই সময়ের মধ্যে আশজিরো এতদূর চলিয়া যাইবে যে, আর তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

আশজিরোর অনুবর্ত্তী হইবার ঐকান্তিক অনুরাগে আশগাও নদীজলে নামিল, জোনাকীদিগকে অন্ধ বৃদ্ধা নারীর প্রেমের পথ প্রদর্শক হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিল এবং বহুবৎসর পূর্ব্বে উজি নদীতে তাহাকে যাহারা প্রেমের আলোক প্রদান করিয়াছিল, আজ তাহারা যেন সে প্রেম সফল করে—এই প্রার্থনা করিল। ক্রমেই নদীর গভীর জলে আশগাও অগ্রসর হইল, এবং নির্ব্বিঘ্নে নদী পার করিবার নিমিত্ত বুদ্ধদেবের নিকট অন্তরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল।

আশজিরো নৌকা হইতে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একরাশি জোনাকী জলের খর স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে সে একরাশি জোনাকী ব্যতীত আর কিছুই মনে করিল না; কিন্তু জানিনা কোন্ অজানিত কারণে সে পুনরায়

পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং কি এক অজ্ঞাত কৌতূহল তাহার মনকে সে দিকে আকৃষ্ট করিল। আশজিয়ো মাঝিকে পশ্চাতে নৌকা ফিরাইবার জন্য অনুজ্ঞা করিল, এবং জোনাকীদলের নিকট আসিয়া দেখিত পাইল—জলের স্রোতে আশগাও ভাসিয়া চলিয়াছে এবং দশ সহস্র জোনাকী তাহার মুখের উপর স্বর্ণ-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। আশজিয়ো তাহাকে নৌকার উপর তুলিয়া লইল এবং কোলে তুলিয়া তীরে অবতরণ করিল, কিন্তু তখনো সহস্র জোনাকী মৃত্যুচুম্বনবদ্ধ আশগাওর তুহিন-শুভ্র-শীতল মুখ খানির উপর স্বুবর্ণ-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল।

লাহোর।

আকাশের প্রণয়ীযুগল

(১)

অনন্ত নীল প্রান্তর—ছায়াহীন, অনন্ত-নক্ষত্র-পুঞ্জ সমাকুল, শীতল আলোকস্পর্শময় ও নীরব; মধ্যে তরল রজত-ধারাবৎ শুভ্র অনন্ত বিস্তৃত ছায়ানদী,—ফেনপুঞ্জ বারিতরঙ্গ বিধূনিত হইয়া ধূম্রবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার পূর্ব্ব উপকূলে সৈকতসিকতায় দাঁড়াইয়া একটী নক্ষত্রবাসিনী তরুণী সারা বৎসরের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও সমগ্র হৃদয়ের সজীব প্রেমভার লইয়া নির্ণিমেষ নেত্রে পশ্চিম উপকূলের প্রেমাস্পদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সারা বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র তাহাদের মিলনের এ ক্ষণিক অবসর! তরুণীর মুখে উৎকণ্ঠা ও আবেগ দুই-ই ফুটিয়া উঠিয়াছে; আনন্দ আবেগের সঙ্গে বিষণ্ণ বিশেষতাও মিশিয়া রহিয়াছে!—ছায়ানদীর দীর্ঘ বিস্তার ও প্রচণ্ড উর্ম্মি আস্ফালন না জানি প্রিয়তমের আগমনে বাধা জন্মায়!—এই উৎকণ্ঠা।

কখনো উর্ম্মির চূড়াগ্রভাগে, কখনো উর্ম্মিমধ্যগত অতল গহ্বরে একখানি ক্ষুদ্র তরণী পশ্চিম উপকূল হইতে নাচিয়া নাচিয়া অগ্রসর হইতেছিল;—তরুণীর দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ। তরুণীর প্রেমাস্পদ হিকোবোশি সেই তরণীতে ক্ষুদ্র দাঁড় দ্বারা সজোরে তরণী চালনা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ক্ষিপ্ত তরঙ্গগুলি প্রতিমুহূর্ত্তে তরণীখানিকে গ্রাস করিবার জন্য বিফল চেষ্টা করিতেছিল। হিকোবোশির সেদিকে দৃষ্টি ছিল না;—কতক্ষণে সে প্রণয়িনী তানাবতার কাছে পৌঁছিবে—এই চিন্তা।—সজোরে—আরো জোরে, সে ক্রমাগত তরণী চালনা করিতেছিল;—দাঁড়ের বারম্বার ক্ষেপণে উৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দু সমূহ শিশিরের মতো ধরণীতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া হিকোবোশির তরণী ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছিল। এখনও কতদূর! প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার নিকট এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল। ওই তো তানাবতা—নদী উপকূলে তাহারি অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া!

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হিকোবোশির হাত হইতে অনবরত জোরে তরণীর দাঁড় নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। তবু পথ ফুরায় না। হাত অবশ হইয়া গিয়াছে, তবু কোথা হইতে বল আসিয়া সজোরে তরণী চালনা করিতেছে। আর কতক্ষণ! তানাবিতা, এই আমি আসিয়াছি,—তোমার শুভ্র হাতের উচ্চ অঙ্গুলিগুলি আমি দেখিতেছি, গলায় তোমার মোতির মালার মিলন-সূত্রখানি আমার চক্ষে পড়িতেছে, তোমার নীল চক্ষের তলে আর্দ্র পক্ষপাতা যে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, তাহাও আমি দেখিতেছি। ভয় নাই, তানাবতা—ভয় নাই, এই আমি আসিয়াছি। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হিকোবোশি তরুণীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আর এক মুহূর্ত্ত! বিলম্ব সহেনা,—হিকোবোশি লম্ফ দিয়া তীরে অবতরণ করিল।

দু'জনে পরস্পর গাঢ় প্রেম-আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

"হিকোবোশি!"

"তানাবতা!"

নদী-উপকূল অজস্র আনন্দ-অশ্রুতে সিক্ত হইতে লাগিল। দুই জনের কণ্ঠ হইতে পুনরায় প্রেমপূর্ণ কণ্ঠস্বর বহির্গত হইল,—

"প্রিয়তম!"

"জীবন-সর্ব্বস্ব!

দিগন্তের প্রান্ত হইতে ধ্বনিত হইল,—"মিলনের শেষমুহূর্ত্ত অতীত প্রায়,—বিদায় লও, বিচ্ছিন্ন হও।"

নিদ্রিতের শয্যা পার্শ্বে বজ্রপাত-শব্দ-চকিতের ন্যায় দুইজন শিহরিয়া উঠিল।

দুই জনের দৃঢ় আলিঙ্গন-বদ্ধ হস্ত আপনিই শিথিল হইয়া পড়িল। নিরাশ হৃদয়ে দুইজন পরস্পরের আঁখির দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

হায়, প্রণয়ে বিধাতার নিদারুণ অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নয়!

শিথিল হস্ত আপনিই সরিয়া আসিল। বেদনাপ্লুত কণ্ঠে হিকোবোশি বলিল,—বিদায়, বিদায় প্রিয়তমে!

দু'জনের চোখে চোখে কি ভাষা প্রকাশ করিল, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

হিকোবোশি তরণীতে উঠিয়া দাঁড়ে হাত দিল। তাহার শিথিল হস্ত নড়িল না। তরঙ্গে তরণী ভাসিয়া চলিল—দূর হইতে দূরে, ক্রমে অদৃশ্য হইতে চলিল।

তরুণী নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উষার তারার মতো অস্ত গেল, কখন? কেহ লক্ষ্যও করিল না. বিমর্ষতার মলিনতা লইয়া প্রভাত তারার মতো কখন সে নিভিয়া গেল।

(২)

বৎসরান্তে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হিকোবোশি ও তানাবতার এ মিলন সংঘটিত হয়। কেন এই অসীম বিচ্ছেদের মধ্যে এই ক্ষণিক মিলন, এবং মিলনের মধ্যে এই দারুণ অভিশাপ! কেনই বা প্রণয়ের মধ্যে এই দুর্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ-নদী প্রবাহিত!

তানাবতা বিধাতার কন্যা; স্বর্গ রাজ্যের সুবিমল জ্যোৎস্না দিয়া তাহার দেহ গঠিত। তানাবতা বালিকা, পিতৃভক্ত ও অনুক্ষণ পিতৃসেবা পরায়ণা এবং বৃদ্ধ পিতার একমাত্র আশ্রয়-যষ্টি। তানাবতা

নিশিদিন পিতার সেবা বই কিছুই জানে না,—পিতার সেবায় তাহার হৃদয়ের সমস্ত সন্তোষ, সমস্ত প্রেম, সমস্ত যত্ন উছলিয়া পড়ে; বিশ্ব জগতের যত কিছু প্রিয়, সমস্তই সে পিতার পূজা-পাত্রে অর্পণ করে।

তানাবতা কৈশোর সীমা উত্তীর্ণ হইয়া নবীন যৌবনের বসন্ত-কাননে পদার্পণ করিয়াছে। তত যৌবনের বসন্ত-সুরভি-শ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত অপূর্ব্ব লাবণ্য ও মোহরসে পূর্ণ হইয়াছে।

সে সময়ে একদিন তানাবতা পিতার কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া একটী নবীন যুবাকে দেখিতে পাইল। তাহার অঙ্গের লাবণ্য দেখিয়া তানাবতা আকৃষ্ট হইল। তানাবতার অন্তরে এমন দারুণ অভাব সৃষ্ট হইল যে বিশ্বজগতের সমস্ত দিয়াও তাহা পূর্ণ হয় না। তানাবতার অন্তরে যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইল,—শীর্ণ, ক্লিষ্ট তানাবতা। বিশ্বস্রষ্টা তাহার অভাব অনুভব করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিলেন।

মুগ্ধা তানাবতার সহিত তদনুধ্যায়ী সেই নবীন যুবক হিকো-বোশির মিলন সংঘটিত হইল।

দুই জনের হৃদয়-তৃষ্ণা পরস্পরকে পাইয়া মিটিল; কিন্তু দুই-জনই পরস্পরের প্রতি এতদূর রত ও অনুরক্ত হইল যে, তানাবতা পিতার প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিল; হিকোবোশিও স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন হইল।

বিধাতা দেখিলেন, তিনি স্বীয় কার্য্য প্রণালীর মধ্যে এমন বিদ্রোহ খাড়া করিয়াছেন যে, কোন কার্য্যই আর সুসম্পন্ন হয় না। সকলেই আত্মতৃপ্তিতে মগ্ন থাকিতে চায়। তখন তিনি আর এক সৃষ্টি করিয়া অতৃপ্তির এক অখণ্ড ধারা সমগ্রের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া

দিলেন। সমস্ত তৃপ্তির মাঝখানে এই অনন্ত অতৃপ্তধারা চির-বিজড়িত হইয়া রহিল,—ধূপের সঙ্গে ছায়া, বায়ুর সঙ্গে বেগ, মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়া সম্মিলিত করিলেন।

সেই অবধি তানাবতা ও হিকোবোশি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে নির্ব্বাসিত হইল। বিধাতার আদেশে দুইজন বৎসরান্তে কেবল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সম্মিলিত হইতে পারে।

সেই অতৃপ্তির ধারাই মানব-জীবনের সহস্র অপূর্ণতার মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে।

আকাশের প্রণয়ীযুগলের দীর্ঘশ্বাস ও প্রেমের অতৃপ্তি মনুষ্য-জীবনেরই রূপক চিত্র।

লাহোর

৩রা চৈত্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

প্রতিজ্ঞা পালন

ইতো নরিসুক—দরিদ্র, কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা ও জ্ঞানগৌরবে সামুরাই বংশের রত্ন স্বরূপ। সৈনিক বিভাগে তাঁহার কোন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব না থাকায় তিনি কোন উচ্চপদবি লাভ করিতে পারেন নাই; কেবল মাত্র বিদ্যাচর্চ্চা ও প্রকৃতি অনুশীলনে তিনি নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। জ্যোৎস্না ও অনিল ছাড়া তাঁহার অন্য সঙ্গীও কেহ ছিল না।*

তিনি নীরবে ধৈর্য্যসহকারে মুগ্ধ অভিনিবেশের সহিত প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় তন্ময় থাকিতেন। তিনি ভাবুক ছিলেন সত্য,—কিন্তু কোষ-বদ্ধ অসিখানা সর্ব্বদাই তাঁহার কটিদেশে সংলগ্ন থাকিত, এবং অলসতার মলিনত্ব তাঁহার মনে কিম্বা তরবারীর ঔজ্জ্বল্যে বিন্দুমাত্র দাগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই;—অসিখানি যেমন উজ্জ্বল চক্‌চকে, কার্য্যেও তেমনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার, ইতো নরিসুকের মন বুদ্ধি ও বিদ্যায় তদ্রূপ উজ্জ্বল ও কর্ত্তব্যে তাঁহার স্বীয় অসিখানিরই সমতুল্য ছিল।

একদিন তিনি 'কোটোবিকিওয়াম' পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানে বেড়াইতে গিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন;—যখন ঘন বনের ছায়াচ্ছন্ন একটা পল্লী-পথে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, ধূসর গোধূলি ছায়াচ্ছন্ন পল্লী-পথে গাঢ় আঁধার ডাকিয়া আনিতেছে,—তখনো অন্ধকার সম্পূর্ণ জমাট বাঁধে নাই,—ক্ষীণ আলোকে পথ দেখিয়া চলা যায়। এমন সময় ইতো তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী পথে একটী তরুণীকে ধীর পাদক্ষেপে চলিতে দেখিতে পাইলেন। ইতো দ্রুত কয়েক পদ চলিয়া তরুণীর

* এটা জাপানী উপমা।

সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি গন্তব্য পথ হারাইয়াছেন,—আমি কি আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি?"

তরুণী মরাল-গ্রীবা ঈষৎ ঘুরাইয়া কল-কণ্ঠে উত্তর করিল—"ধন্যবাদ আপনাকে—সদাশয় বীর! আমি এই পথে অতি সন্নিকটেই যাইব।"

ইতো উত্তর করিলেন,—"আমি এই পথেই গমন করিব, আপনার সহযাত্রিক হইতে আপত্তি আছে কি?"

তরুণী উত্তর করিল,—"বেশ ত, এক সঙ্গেই চলুন। আমি এই স্থানেরই একজন রাজকুমারীর সহচরী, তিনি অতিশয় সদাশয়া ও দয়াবতী।"

ইতো তরুণীর কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন,—তিনি সদ্‌বংশীয়া ও উচ্চ পরিবারের রীতিনীতিতে অভিজ্ঞা।

দুই জনে কথা বলিতে বলিতে একটী সরু পথের মোড়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। গাঢ় অন্ধকারে দু একটী বিশীর্ণ জ্যোৎস্না-রশ্মি বৃক্ষের পত্রাবচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণপথে কোন মতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় তরুণী বলিল,—"আপনি কি এই সরু পথে অত্যল্প দূর যাইয়া আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন?"

ইতো সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দুই জনে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

ইতো এই নির্জ্জন পল্লীতে এতাদৃশ প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং মনে করিলেন, নিশ্চয়ই কোন উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক কোন কারণে কিংবা নির্জ্জন-বাসের সুবিধার জন্য এই অখ্যাত পল্লীতে বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন।

সুশোভন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তরুণী বিনম্রভাবে বলিল,—"আপনাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ এখানে বিশ্রাম করিয়া যাইতে হইবে; ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি ভিতরে সংবাদ দিতেছি।"—এই বলিয়া তরুণী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইতো দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"জন্মে কখনো ধনী বা সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের সহিত আলাপ পরিচয়ের সুবিধা হয় নাই, কখনো তাহা স্বেচ্ছায় অভিলাষও করি নাই, আজ অনুরুদ্ধ হইয়া যখন এ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা কখনো পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে।" ইতিমধ্যে একজন প্রৌঢ়াসহ পূর্ব্বের সহচরী ইতোর অভ্যর্থনার্থ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

ইতো তাহাদের সমভিব্যাহারে গৃহের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া গৃহের বহুমূল্য উৎকৃষ্ট সাজ-সজ্জাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

রত্নখচিত একখানি আসন ইতোর বসিবার জন্য প্রদত্ত হইল। প্রৌঢ়া বিনয়নম্র বচনে বলিলেন,—"আপনার সদয় ব্যবহারে আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি; আপনিই ত উজিনগরবাসী ইতো নরিস্থুক?"

ইতো একজন অপরিচিতার মুখে স্বীয় পরিচয় শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি ত রাজকুমারীর সহচরীর নিকট আত্ম পরিচয় ব্যক্ত করেন নাই!

প্রৌঢ়া পুনরপি বলিলেন,—"ইতো সামা, আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আজিকার মত এখানেই আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। আপনি আমাদের অপরিচিত নহেন,—আপনার পরিচয়াদি আমরা বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের রাজকুমারী দৈবাৎ আপনাকে দেখিতে পাইয়া আপনার প্রতি নিরতিশয়

অনুরক্ত হন, তদবধি তিনি আপনার চিন্তায় অনুক্ষণ বিমর্ষ থাকিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সেইজন্ত আপনাকে পত্র লিখিয়া আনাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আজ আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ; তজ্জন্ত আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমাদের একান্ত ইচ্ছা,—অদ্যই আমরা রাজকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই,—আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন কি ?"

ইতো অকস্মাৎ এই আশাতীত সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"আমি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই—বিবাহ বিষয়ে আমার অনিচ্ছাও নাই, তবে বিবাহের পূর্ব্বে বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ লওয়া যুক্তিযুক্ত।"

প্রৌঢ়া সহাস্তে বলিলেন,—"আমাদের রাজকুমারীকে দেখিলে আপনার আর কোন দ্বিধাই থাকিবে না,—আজই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে আসিয়া বসুন।"

ইতো এবার যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় এবং নানা বহুমূল্য দ্রব্যে নিপুণতা সহকারে সজ্জিত।

গৃহের এবম্বিধ উজ্জ্বল ও মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন ;—কিন্তু রাজকুমারী যখন সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, স্বর্গের নক্ষত্র-বালিকা তানাবতার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, আজ সে-ই যেন সশরীরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ! কী রূপ—স্নিগ্ধ ও কোমল ! কী শ্রী—শান্ত ও সুষমাময় ! কী লাবণ্য—যেন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-তরঙ্গ !

ইতো এত রূপ দেখিয়া মুগ্ধ ও ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং অচপল দৃষ্টিতে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন।

প্রৌঢ়া বলিলেন,—"ইতো সামা, ইনিই আমাদের রাজকুমারী। রাজকুমারী, তোমার প্রেমপাত্র ইতো সামার সম্বর্দ্ধনা কর।"

রাজকুমারী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ইতোর কর-পল্লব গ্রহণ করিলেন, এবং দুইজন একত্রে একটী টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

প্রৌঢ়া সহচরীকে বলিলেন,—"বিবাহের ভোজ্যদ্রব্যাদি ও পুষ্পদল বর-কন্যার সম্মুখে স্থাপন কর।"

যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হইল। ভোজন পরিসমাপ্ত হইলে ইতো প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কন্যার বংশ-পরিচয়ের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া কন্যার মুখ যেন কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল; প্রৌঢ়াও একটু কম্পিত ভাবে উত্তর করিলেন,—"বংশ পরিচয় আর আপনার নিকট গোপন করা উচিত নয়, আপনার স্ত্রী হিমিগিমি সামা দেশপূজ্য হিকি জেনারেল শিগিহির কন্যা।"

ইতোর সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল! কী! হিকি জেনারেল!—তিনি কত শতাব্দী পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছেন!—তাঁহার কন্যা!—একি স্বপ্ন—না মায়া! না, চতুর্দ্দিকের এই ছায়ামূর্ত্তি সকল তাঁহাকে মায়াজালে নিবদ্ধ করিয়াছে!

ইতো বীর পুরুষ, তিনি স্বীয় মুখের ভাবে বা কথায় কিঞ্চিৎ মাত্র ভয় বা বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন না; যেন তিনি মনুষ্যের সহিত নিতান্ত সাধারণ ভাবে কথা কহিতেছেন—এমনই সহজ সুরে বলিলেন,—"হায়! কী বীরত্ব দেখাইয়া হিকি জেনারেল প্রাণত্যাগ করিলেন!"

প্রৌঢ়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন,—"আমাদের প্রভু ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন, বিপক্ষের তীর আসিয়া তাঁহার ঘোড়ার শরীরে লাগিল,

অশ্ব ভূপতিত হইতেই তিনি অনুচরবর্গের নিকট দ্বিতীয় ঘোড়া চাহিলেন ;—যুদ্ধে তাঁহার অক্লান্ত আনন্দ ছিল ; কিন্তু অনুচরবর্গ প্রভুর বিপদ বুঝিয়া দ্রুত পলায়ন করিল, তিনি হতাশ হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তীর আসিয়া তাঁহাকেও বিদ্ধ করিল।"

এই কথা শুনিয়া সহচরীও কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"হায় ! আমাদের দয়ালু প্রভু ; তাঁহার অসীম গুণের কথা কে না জানে !"

প্রৌঢ়া পুনরপি বলিতে লাগিলেন,—"রাজকুমারীর মাতার মৃত্যুর পর আমার উপরই কন্যার প্রতিপালনের ভার অর্পিত হয়। আজ আপনার করে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।"

এই কথার পর প্রৌঢ়া ও সহচরী রাত্রির সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

ইতো তখন পার্শ্বোপবিষ্টা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় তুমি আমাকে প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলে ?"

হিমিগিমি স্বপ্নের মতো পেলব কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমি যখন বাল্যকালে ইশিওয়ামের মন্দিরে যাই, তখন আপনাকে প্রথম দেখিতে পাই, তদবধি আমি মুগ্ধ হই ; তারপর আপনার দেহের কতবার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু আপনাকে পাইবার নিমিত্ত আমি এই একই ভাবে কাটাইয়াছি।"

ইতো বলিলেন,—"তখন হইতেই তুমি আমাকে ভালবাস ?"

হিমিগিমি উত্তর করিলেন,—"প্রাণনাথ, আপনার ভালবাসা বুকে করিয়া আমি কত যুগযুগান্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আজ যে আমাকে বিনা বাধায় নিঃসঙ্কোচে প্রাণপূর্ণ ভালবাসা দিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন, তাহাতে আমার ক্ষীণ অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার বাঁধ আর মানিতেছে না। পদপ্রান্তে রাখিবার অযোগ্যাকে আপনি যে ভালবাসায়

বুকে তুলিয়া লইলেন, পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আমার আর কি আছে!"

দুজনের কথাবার্ত্তায় ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময় কক্ষান্তর হইতে ধ্বনিত হইল,—"আর বিলম্ব নয়—বিদায় লও, সময় সমাগত।"—এই বলিয়া প্রৌঢ়া সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ইতো নরিসুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আজ বিদায় গ্রহণ করুন, আমরা এখনই অন্যত্র যাইব, পুনরায় আপনারা মিলিত হইবেন।"

হিমিগিমি করুণ কণ্ঠে বলিলেন,—"নাথ, এখন বিদায় চাই। এখনই আমাকে পিতা মাতার কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে—পুনরায় আসিব; দশ বৎসর পর এই দিনে আপনাকে লইতে আসিব—তত-দিন মনে রাখিবেন ত?"

ইতো ইতিপূর্ব্বেই আসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং হিমিগিমির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ক্রমেই যেন তাহার মুখখানি ছায়ার মত বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার মুখের লাবণ্য যেন অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

হিমিগিমি একটী সোনার দোয়াত কলম ইতোর হাতে দিয়া বলিলেন,—"নাথ, এইটী আমার উপহার।" ইতো স্বীয় কটিস্থিত সুদৃশ্য খাপ সমেত অস্ত্রখানি হিমিগিমির হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই লও আমার উপহার।"

ইতো গৃহ হইতে বাহির হইয়া, উষার ঈষৎস্ফুট আলোকে পথ দেখিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত স্থলে উপস্থিত হইয়া গৃহাদির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না; বিপুল অট্টালিকা যেন মায়া-মন্ত্রে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

তৎস্থলে ঘনপরিবেষ্টিত বন-গুল্মের অজস্র অবির্ভাব! তিনি যেন চক্ষুকে ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বারম্বার হস্ত পরিঘর্ষণে চক্ষুর কুহেলিকা অপনয়নের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দৃশ্য পূর্ব্ববৎ,—বনগুল্মের সুদৃঢ় আচ্ছাদন বই কিছুই নাই!

তরুণ সূর্য্য হাসিয়া উঠিল। তারপর ইতো বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; সকলে তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল, এবং দেখিতে পাইল, ইতো সর্ব্বদায়ই একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত দোয়াতের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে বিবাহ করাইয়া তাঁহার মন-স্থৈর্য্যের সঙ্কল্প করিলেন।

ইতো দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলেন,—"পৃথিবীর কোন জীবিত রমণীকেই আমার বিবাহের অভিলাষ নাই।"

সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যের আশে পাশে পথিকেরা বহুবার একটী মনুষ্যকে উন্মনস্কের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে!

দশ বৎসর পর ইতো কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন এবং মৃত্যুর প্রাকালে নানা প্রকার প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, কিন্তু মৃত্যু-মলিন দেহে একটা গভীর আনন্দের রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শেষ কণ্ঠস্বর মাত্র শোনা গেল,—"এসেছ—তবে চল।"

লাহোর

৩রা চৈত্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

গুর্জর রাণী

মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে প্রশস্ত সোপানাবলী নদীজলতল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে; মন্দিরটী বহু পুরাতন, তাহার পদতল ধৌত করিয়া একটী স্বচ্ছ জলরেখা,—কেবলমাত্র বর্ষায় কুলপ্লাবিনী আবিলা উচ্ছলা তরঙ্গিণী, অন্য সময় বালুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের প্রান্ত-বাহিনী একটী শীর্ণ জলরেখা মাত্র;—এই শীর্ণ জলধারাটী এক বর্ষা শেষে বালুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের একপ্রান্তে, অপর বর্ষাশেষে অপর প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে,—কিন্তু কোন বর্ষাশেষেই বিসর্পিণী নদীর বঙ্কিমাগ্রবর্ত্তী মন্দির স্থানটীর পদতল পরিত্যাগ করেনি,'—সেই জন্য মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে যখন মন্দিরের ছায়া' নদীজলে হেলিয়া পড়িত, তখন তৃষ্ণার্ত্তবালুবিস্তীর্ণপ্রান্তরের ভয়েই যেন শীর্ণকায়া স্রোতধারা মন্দিরের ছায়াতলে এক কোণে আশ্রয় লইয়াছে মনে হইত।

মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতীরে পুরাতন পরিত্যক্ত একটী রাজ-প্রাসাদ; তাহার প্রাকার-মূলের তলে তলে নদীর স্বচ্ছ জলধারা। বহু কক্ষ ও বাতায়ন যুক্ত বিস্তীর্ণ প্রাসাদ ভবনটীর স্তব্ধ মূর্ত্তি কোন্ পুরাতন দিনের স্মৃতিকে যেন সজাগ করিয়া রাখিয়াছে; তাহাতে কালের সহস্র করাঙ্কিত বাহিরের মলিন কৃষ্ণকান্তি রাজপ্রাসাদটীর শীর্ণ অবস্থা মনে করিয়া তাহার অভ্যন্তরের অভাবনীয় ক্ষুধার পরিচয় দিতেছে; কালের কত স্মৃতি তাহার মধ্যে বন্দী—কে জানে? কত ঘটনার মর্ম্মশ্বাস, অচেতন ভাবে তাহাকে না জানি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে! রহস্য,—নিদ্রিত রাজকুমারীর শয্যা-প্রান্তবর্ত্তী স্বর্ণ ও রৌপ্যদণ্ড পরিচালনে কে জাগ্রত করিবে!

মন্দিরের ছায়াতলে শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী ধীর পাদক্ষেপে বহিয়া যাইত ; তাহার সুবিন্যস্ত পদক্ষেপ ঈষৎচঞ্চল স্রোত-ধারার মধ্যে যেন দেখা যাইত। নদীটী আরাবল্লীর দুর্গম গিরি-প্রান্তর ও অরণ্য ভেদ করিয়া এ সমতল প্রদেশে আগমন করিয়াছে ; নদীর নাম সাগরমতী বা সাবরমতী।

নদীজলে অসংখ্য মাছ নাচিয়া বেড়াইত, আমরা কয়েকজন বন্ধু সময় সময় মাছগুলিকে আহার প্রদান করিয়া কৌতুক ও আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত এই মন্দির-সোপানে আসিয়া উপবেশন করিতাম।

একদিন দুপ্রহরে সম্মুখস্থ প্রান্তরের তপ্ত বালুরাশি যখন কম্পিত জিহ্বা প্রসারিত করিতেছিল, বনপল্লবব্যজন মধ্যাহ্নের তন্দ্রালস মদিরায় শিথিল হস্তে দুলিতেছিল—পবন যেন আধঘুমে সহসা এক এক বার ব্যজনখানি জোরে নাড়াইতেছিল,—তখন গুর্জ্জরের একটা পুরাতন চিত্র বিস্মৃতির কবর-শয্যা হইতে নড়িয়া উঠিয়া তা'র পুরাতন প্রকৃতিকে সম্মুখে দেখিয়া স্মৃতির মধ্যে সজাগ হইয়া উঠিল।

* * *

একটী তরুণী মৃণ্ময় কলসী কক্ষে লইয়া ধীরে ধীরে বনান্তের একপ্রান্ত হইতে চূর্ণ একখণ্ড কিরণের মতো নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ সে একাগ্রভাবে দূর প্রান্তরের দিকে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি সুদূর প্রান্তরের বনরেখার তীরে কাহাকে খুঁজিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে সেই বনরেখা বিদীর্ণ করিয়া একজন অশ্বারোহীর অস্পষ্ট মূর্ত্তি প্রান্তরের দিকে দ্রুত আসিতেছে দেখা গেল। তরুণীর মুখ

উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ মধ্যেই সেই অশ্বারোহীটী নদী-স্রোত-রেখাটীর অপর পারে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। লোকটী একজন অশ্বসাদী; সৈনিক পরিচ্ছদে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত,—লৌহ বিনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ ও অঙ্গাবরণ, কটিদেশে শাণিত তরবারী এবং হস্তে সুদীর্ঘ বর্শা।

সৈনিক পুরুষ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি গুজরী, ভাল আছ তো? এ দু'দিন আস্‌তে পারি নি'। কি জানি কেন, বাদশাহ আমার প্রতি বড় সন্দিহান হয়েছেন। আমি প্রত্যহ কোথায় যাই জান্‌তে চেয়েছেন। কি করি, তাই এ দু'দিন আসি নি'। আজ এই ৭০ মাইল যেন এক নিশ্বাসে চলে এসেছি। তোমাকে যেন কত দিন দেখি নি', তোমাকে একদিন না দেখ্‌লে প্রাণে যে কি কষ্ট হয়, কি বলবো গুজরী।"

তরুণী বলিল,—"তোমার জন্যও ভেবে ভেবে আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। তোমাদের যে ব্যবসা,—মানুষ হয়ে মানুষের গায়ে অস্ত্রাঘাত,—এ তোমাদের কেমন ধর্ম্ম?"

সৈনিক বলিল,—"গুজরী, এ বীরের ধর্ম্ম। তুই স্ত্রীলোক হয়ে তা কি করে বুঝবি?"

তরুণী উত্তর করিল,—"কেন দাদা, বীর কি মানুষ হয় না? বীর কি কেবল ভাইয়ের বুকে অস্ত্রাঘাত করতেই জানে? পরকে হনন করাই কি বীরের ধর্ম্ম?"

সৈনিক বলিল,—"না গুজরী, বীরের তাহা ধর্ম্ম নহে। দুর্ব্বলকে রক্ষা এবং আততায়ীকে বিনাশই বীরের ধর্ম্ম।"

গুজরী বলিল,—"দাদা, তোমার জন্য আমার সর্ব্বদাই ভয় হয়; যুদ্ধে তোমার অতুল আনন্দ। তোমার যেমন মহৎ অন্তঃ-

করণ, সকলের তো তাহা নহে। মানুষ মানুষকে কষ্ট দিতেই যেন ভালবাসে। মানুষ দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়াই সুখ পায়। কয়জন দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়? দাদা, তুমি হিংস্র সৈনিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সংসারে প্রকৃত বীর নাম অর্জ্জন কর।"

সৈনিক পুরুষ বলিল,—"তাহাই আমার প্রাণের ইচ্ছা! কেবলমাত্র তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমি এই সৈনিক বৃত্তি ধারণ করিয়াছি। সৈনিক বৃত্তি বীরের বৃত্তি, তাহা দ্বারাও অনেক দুর্ব্বলকে রক্ষা করা যায়। ভাবিতেছি কবে তোমাকে উদ্ধার করিয়া আমার এ সৈনিক-জীবন-ব্রত সফল করিব। আর সেই আততায়ীর হত্যা করাও আমার জীবনের ব্রত। যে আমার আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া শৈশবে তোমাকে মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়াছে, তাহাকেও বধ করিতে হইবে।"

গুর্জ্জরী করুণ কণ্ঠে বলিল,—"দাদা, কাজ নাই এ বিবাদে, চল আমরা নির্ব্বিঘ্নে নিজের দেশে ফিরিয়া যাই। কল্য ভীল-সর্দ্দার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লুণ্ঠনে বহির্গত হয়েছেন।"

সৈনিক পুরুষ বলিল,—"গুর্জ্জরী, সেই অদ্ভুত নৃশংসতা—সেই জঘন্য শোণিত পাতের প্রতিহিংসা কি দিব না?"

গুর্জ্জরী শুষ্ক মুখে বলিল,—"দাদা, শত্রুকে ক্ষমা কর, তাহাই তোমার মহত্ব।"

সৈনিক পুরুষ উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"কি বলিস্ গুর্জ্জরী! যে আমার পারিবারের রক্তস্রোতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে, আমি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াও না তাহাকে ক্ষমা করিব! তোরই দোষ কি! তুই তখন তিন বৎসরের বালিকা মাত্র। যে প্রতি-

হিংসার অগ্নিশিখা আজ দশ বৎসর যাবৎ আমার হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইয়া রহিয়াছে, সেই পাপিষ্ঠের শোণিত-তর্পণ ব্যতীত তাহা কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবে না।”

গুজরী ছুটিয়া গিয়া সেই আগন্তুক সৈনিকের পদযুগ ধরিয়া বলিল,—“দাদা, এ ভগিনীর অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি তাহার গায়ে অস্ত্রাঘাত করিও না। ভগবান তাহার শাস্তি বিধান করিবেন।”

সৈনিক পুরুষ কতক্ষণ কি চিন্তা করিল, তৎপর গুজরীর হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল—“গুজরী, তুমি শৈশব হইতে ভীল-গৃহে প্রতিপালিত হইয়া তৎপ্রতি স্বভাবতঃই স্নেহপরায়ণা হইয়াছ। কিন্তু গুজরী, যে প্রতিশোধ-শিখার দীপ্ত অগ্নি আমার শিরায় শিরায় জ্বলিতেছে, তাহা কি একদিনে নিভিয়া যাইবে?”

গুজরী করুণ কণ্ঠে বলিল,—“দাদা, শক্রকে তুমি ক্ষমা কর। চল আজই আমরা এ দেশ পরিত্যাগ করি। ভগবান আততায়ীর শাস্তি বিধান করিবেন।”

সৈনিক পুরুষ পুনরায় কতক্ষণ কি ভাবিল, তারপর বলিল—“গুজরী, আজ ঘরে যাও, শীঘ্রই এক দিন এসে তোমাকে উদ্ধার করবো। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে বাদশাহের সমক্ষে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তোমাকে কি শেষে ব্যাঘ্রের গহ্বর থেকে উদ্ধার ক'রে কুম্ভীরের আহার্য্য করবো। গুজরী, রূপ বিধাতার দান, রূপ মানুষের পরম শক্রও বটে। রূপের অনলে দগ্ধ হইতে মানুষ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করে। তাই ভাবিতেছি, আজ তোমাকে লইয়া বাদশাহের সমক্ষে গেলে বিপদ ঘটিতে পারে। পুনরায় এক দিন আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।”

এই বলিয়া সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গুজরীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্বে কশাঘাত করিল। অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিল। গুজরী এক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এই অশ্বারোহী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দ্বিতীয় একজন অশ্বারোহী আসিয়া তাহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল,—"রামসিং, এত তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটাইয়া কোথায় এসেছিলে?"

রামসিং অবজ্ঞার স্বরে উত্তর করিল,—"সে কথায় তোমার প্রয়োজন?"

দ্বিতীয় অশ্বারোহী তিরস্কার ও ক্রোধপূর্ণ স্বরে বলিল,—"প্রয়োজন আছে কিনা শীঘ্রই জানিতে পারিবে; বিপক্ষ কোন দলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে রাজ্য লুটে নিতে ইচ্ছা হয়েছে কি?"

রামসিং ক্রোধপূর্ণ স্বরে বলিল,—"সাবধান সয়তান, প্রলাপ বকিলে এখনই উচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। যখন কিছু বলিবার হইবে আমি স্বয়ং বাদশাহের সমক্ষে বলিব।"

দুইজনে এক দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। তরুণী গৃহে ফিরিল।

তরুণীর নাম গুজরকুমারী; ভীল-সর্দ্দার আশাভীলের এক মাত্র কন্যা; এ প্রস্ফুটিত কমলটী ভীল-সর্দ্দারের স্বীয় দুহিতা কি পালিতা কন্যা, সে কথা একরূপ অজ্ঞাত। তবে এত দিব্যশ্রী নিশ্চয়ই ভীলকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই; তবে আশা স্বীয় দুহিতার মত স্নেহে ইহাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

নদীতট-সংলগ্ন স্থানেই সর্দ্দার আশাভীলের স্বীয় নগরী, নাম—আশাবার। দুর্দ্দান্ত প্রতাপে আশা চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি আপনার করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং লুণ্ঠন ব্যপদেশে স্বীয় দলবল সহ

ইদর, মালব ও রাজবারা প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহার আদরের কন্যা, রূপের প্রতিমা গুজ্জরকুমারী তাহার জীবনের স্নেহ-উৎস। এই অতুল্য কন্যাটীকে লুণ্ঠন সামগ্রীর সহিতই কুড়াইয়া আনিয়াছিল সম্ভব, কিন্তু তৎপর দুহিতার মতো স্নেহে তাহাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

* * *

একদিন বজ্রনিনাদে আসিয়া বাদশাহীসৈন্য আশাবার আক্রমণ করিল। সর্দ্দার আশাও স্বীয়সৈন্য সহ নদীতটে আসিয়া তাহাদের উপর নিপতিত হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই তৃষ্ণার্ত্ত মরু-প্রান্তর সৈন্য ও অশ্বের বিগলিত রক্তধারা পান করিতে লাগিল। তাহার লোলমাখা জিহ্বার উপর কত সৈন্য ও অশ্ব চিরনিদ্রিত হইল। আশাভীলের অতুল পরাক্রমে বাদশাহীসৈন্য অনেক ক্ষতি সহ্য করিল; কিন্তু অধিক সংখ্যক বাদশাহীসৈন্যের নিকট সম্মুখ যুদ্ধে ভীল-সৈন্য পরাজিত ও আশাভীল নিহত হইল।

এ যুদ্ধে রামসিংহের অদ্ভুত সাহসবীর্য্য সহস্র সৈনিকের উদাত্ত চিত্তকেও সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছে। সহস্র ভীলসৈনিকের মধ্যে প্রলয়ধ্বংসী বজ্রের মতো রামসিংহের শাণিত তরবারী প্রতি মুহূর্ত্তে বহু সৈনিকের অন্তিম শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছে। বাদশাহ তাহার এ বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া ভীলপরগণার শাসনভার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছে।

* * *

গুজ্জরকুমারীকে হস্তগত করিবার জন্যই বাদসাহের এ অভিযান, কে জানিত? বাদশাহ ছদ্মবেশে আসিয়া তাহার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিল।

গুজরকুমারী হস্তগত হইল। বাদশাহ এই স্থানের সুবঙ্কিম-নদী ও বনবীথির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিল,—"এই স্থানেই আমার রাজধানী হোক্।"

শীঘ্রই সেখানে কঠিন প্রস্তরের অভ্রংলিহ রাজপ্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হইল। বনের শোভার বুকের মধ্যে অশান্তি যেন আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এতকাল যে বৃক্ষলতা গলাগলি হইয়া সুনিবিড় স্নেহে বর্দ্ধিত হইতেছিল, সহস্র পাখী যাহার আশ্রয়ে কুটীর বাঁধিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছিল, আজ সে সকলে বাধা পড়িল।

সৌন্দর্য্যের সহস্র শান্তির উৎস হইতে বিচ্যুত হইয়া গুজর-কুমারী পাষাণ-প্রাচীর-বদ্ধ অন্তঃপুর নামক কারাগারে বন্দিনী। বন্দিনী—গুর্জ্জরের রাজরাণী; অগণিত ধনরত্ন তাহার পদতলে লুটাইতেছে, সুখ আয়াসের সহস্র উপকরণ তাহার চতুর্দ্দিকে সজ্জিত, স্বয়ং বাদশাহ তাহার প্রেম ভিখারী,—তবু গুজরকুমারীর মনে কিছু-মাত্র সুখ শান্তি নাই। প্রকৃতির সহজ স্নেহ-জালের মধ্যে যাহার জীবন বর্দ্ধিত, রাজ-প্রাসাদের নিরুদ্ধ কক্ষ-প্রাচীরের মধ্যে তাহার শান্তি কোথায়!

গুজর রাণী ভাবে, ছাই—রাণীর ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব বিভব! তুচ্ছাদপি তুচ্ছ সে গৌরব, যে গৌরবে স্বাধীনতার কণা মাত্র বিদ্যমান নাই!

আজ পর্য্যন্ত বাদশাহ গুজরকুমারীর বিন্দু মাত্র স্নেহ ভালবাসা লাভে সমর্থ হয় নাই। বাদশাহের ভাণ্ডারের অগণিত ধনরত্ন, সুখ তৃপ্তির সহস্র আয়োজন গুজরকুমারীকে সুখী করিতে পারিল না। হায়! রাজরাণী, অগণিত ধনরত্নের অধিকারী হইয়াও তুমি শান্তি

সুখের ভিখারী। শান্তি বিনামূল্যের মাণিক,—হৃদয় দিয়া তাহাকে কিনিতে হয়, ধন রত্নে তাহাকে পাওয়া যায় না।

* * *

এক দিন জ্যোৎস্না-ধারায় "হেরামের" পার্শ্বস্থ উপবনটী স্নাত হইতেছিল। জ্যোৎস্না এখানে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল,—কারণ এখানে তাহা দুষ্প্রাপ্য। বৃক্ষ-কুঞ্জের মধ্যে আলো ছায়ার অচ্ছেদ্য গলাগলি; "বরাস" ও "হি আসমানের" গন্ধে পবন মাতোয়ারা; বুলবুল মুগ্ধ!

কুঞ্জপ্রান্তে দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি প্রকৃতির উৎসবের মধ্যে তন্ময় হইয়া কি বলাবলি করিতেছিল; একজন বলিল,—"দাদা, আমাকে এ নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"কেন বোন্, তুমি এখন গুর্জ্জরের রাজ-রাণী। তোমার কি কষ্ট?"

প্রথম ব্যক্তি বলিল,—"কী কষ্ট! বন্দীর স্বর্ণ শৃঙ্খলে আর লৌহ শৃঙ্খলে কী প্রভেদ ভাই? বনে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়াছি। কী সে আনন্দের দিন! তখন তোমাকে দেখিতে পাইতাম। স্বাধীন স্বচ্ছন্দে বিহঙ্গিনীর মতো বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এখন দাদা, সত্যি, পিঞ্জরে বন্দী পাখী। আমার আর কে আছে, কাহাকে বলিব?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—"গুজরী, ভগবান আছেন। তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ কর।" তৎপর দ্বিতীয় ব্যক্তি গুজরীর হাত খানি ধরিয়া পুনরপি বলিল,—"গুজরী, প্রাণের গুজরী—আজ চলিলাম।"

গুজরী ম্রিয়মাণ মনে উক্ত আগন্তুকের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় তাহাদের পশ্চাতে শুষ্কপত্রে সতর্ক পা ফেলিয়া কে আসিতেছিল; তাহার গমনভঙ্গী দেখিয়া গাছের বুলবুল ভয়ে চুপ করিল, জ্যোৎস্নাও যেন মেঘে ঢাকা পড়িয়া মলিন দেখাইল। আগন্তুকের পদশব্দ পূর্ব্বোক্ত দুইজনের কর্ণে পৌঁছিল না। আগন্তুকের কটিস্থিত তরবারি তাহার কম্পিত শিরা উপশিরাগুলি সজোরে জড়াইয়া ধরিল এবং মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া গুজরীর কণ্ঠে বসাইয়া দিল!

গুজররাণী ছিন্নশির হইয়া ভূপতিত হইল। আগন্তুক বজ্রকণ্ঠে বলিল,—"কে তুই সয়তান, ঘৃণিত কুক্কুর! নির্জ্জনে গভীর রাত্রে বাদশাহের অন্তঃপুরে এই ঘৃণ্য ব্যবহার!"

রামসিং নড়িলও না।—সেই খানেই অকম্পিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তৎপর কঠোর কণ্ঠে বলিল,—"বাদশাহ, তুমি নিরপরাধীর শাস্তি বিধান করিয়াছ; গুজররাণী স্বর্গের ফুল—নিষ্কলঙ্ক দেবী। হতভাগ্য আমি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি নাই। নির্জ্জনে বাদশাহের অন্তঃপুরে আসিয়া আমিই অপরাধ করিয়াছি। গুজরকুমারী, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। হতভাগ্য আমি—আমিও চলিলাম!

রামসিংহ কটিস্থিত ছুরিকা সজোরে স্বীয় বক্ষে বিদ্ধ করিয়া গুজরকুমারীর পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল।

বাদশাহ অনুচরবর্গকে বলিল,—"দুই প্রেমিককে এই স্থানেই এক সঙ্গে পুঁতিয়া রাখ।"

* * * *

তারপর বুলবুল এ কবরের আশে পাশে করুণ কণ্ঠে গাইত,—চুপ, চুপ, ভ্রাতাভগ্নী দুই জন এখানে নিদ্রিত!

লাহোর

৩০এ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

ইয়োশিস্তুন

বৌদ্ধ মঠে।

একটী সুন্দর প্রান্তরের এক প্রান্তে একটী বৌদ্ধ মঠ, মঠের চতুর্দ্দিকে 'উইলো' ফুল ও 'আইভি' লতায় আচ্ছন্ন প্রাচীর, প্রাচীরের কোল ঘেঁসিয়া অনেকগুলি বহুশাখাসমাচ্ছন্ন বৃক্ষ লতাপুষ্পপল্লবে বিজড়িত হইয়া নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার ছায়া নিবদ্ধ বুকে বৌদ্ধায়তন খানি ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো প্রতীয়মান হয়। মাঠের মধ্যে দূর হইতে কৃষকেরা মঠের চূড়াখানি মাত্র দেখিতে পায়, এবং আরতির ঘণ্টা শুনিলে তাহারি দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে। চতুর্দ্দিকস্থ পল্লীর কৃষক ও কৃষকপত্নীরা ছেলের নামকরণ ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এই মঠে সমাগত হয়।

মন্দিরে একটী বৌদ্ধ-বিগ্রহ, একজন বৃদ্ধ পুরোহিত ও তাঁহার কয়েকটী শিষ্য বাস করেন। এই মঠটী ধর্ম্মশিক্ষার একটী আশ্রমের মতো। বৃদ্ধ পুরোহিত প্রাচীন পুঁথিপত্র উল্টাইয়া শিষ্যবর্গকে অহিংসা, নির্ব্বাণ ও ত্রিতত্ত্ব বিষয়ে নানা উপদেশ প্রদান করেন। বার্দ্ধক্যে পুরোহিতের সমস্ত কেশগুলিই সাদা হইয়া গিয়াছে। অতি অল্প বয়সে প্রথম যৌবনের অরুণ রাগে তাঁহার দেহ মন যখন উৎফুল্ল ও শোভাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি মঠের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন, এই মঠের কার্য্যেই তাঁহার দেহ মন জরায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং এই মন্দিরের কার্য্যেই যে তাঁহার বার্দ্ধক্য জীবনের অবশিষ্ট চিহ্নটুকু বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত। পুরোহিতের সমস্ত শিক্ষা ও সাধনা এই মন্দিরেই সম্পন্ন হইয়াছিল, কাজেই তাঁহার মনে বর্ত্তমান সংসারে অবস্থানের চিন্তা অপেক্ষা দুর্জ্ঞেয় পরলোকে

বাসের চিন্তা অধিক বলবৎ হইয়াছিল। এই মঠে যতটী শিষ্য বা শিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে, সকলেই ভাবী পুরোহিত বংশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে,—এই চিন্তায় বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় তদীয় শিষ্যবর্গের কঠোর বৈরাগ্য কৃচ্ছ্র সাধনোদ্দেশ্যে দৃঢ় যত্নবান হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার অন্তিম জীবনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তবে মঠে দু'একটী বিভিন্ন ভাবাপন্ন শিক্ষার্থীও উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মিনমতো ইয়োশিস্তন সর্ব্বপ্রধান।

মঠের সেই বদ্ধ নির্জ্জীব শিক্ষা তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগিত না;—পুরাতন জীর্ণ ধর্ম্মপুস্তকগুলি দেখিলে তাহার মনে যে প্রকার করুণ রসের সঞ্চার হইত, কার্য্যকালে আর তাহাকে তদ্রূপ বোধ হইত না। এই পুস্তকগুলি অধ্যয়ন কালে তাহার মনে করুণ রসের পরিবর্ত্তে বিরক্তি ও রৌদ্র রসেরই অধিক আবির্ভাব ঘটিত। বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসাময় করুণ ভাবগুলি তাহার মনে তাদৃশ ফলবতী হইত না। দেশের ইতিহাস ও স্বদেশ প্রেমিক বীরগণের জীবন-আখ্যান পাঠ করিতেই ইয়োশিস্তন অধিক ভালবাসিত; কিন্তু মঠে সে প্রকার গ্রন্থ একখানিও সুলভ ছিলনা। ধর্ম্মগ্রন্থের নির্জ্জীব করুণ ভাবগুলির মধ্যে ইয়োশিস্তন স্বীয় মনকে আবদ্ধ রাখিতে পারিত না। অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ও দেহ সুদৃঢ় ও সুগঠিত করিবার আন্তরিক ইচ্ছা তাহার বাড়িয়া গিয়াছিল।

পুরোহিতের শিক্ষা দীক্ষা ও তাঁহার সহচর বর্গের সাধনা—সমস্তই তাহার নিকট স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। একটি নির্জ্জীব কাষ্ঠবৎ বৌদ্ধ বিগ্রহ গড়িয়া উঠিবার জন্য শিষ্যমাত্রেরই আন্তরিক যত্ন ছিল—কিন্তু এ বিষয়ে ইয়োশিস্তনই সর্ব্বাপেক্ষা অপারগ ছিল। ইয়োশিস্তনের বড় দুই ভাই এই আশ্রমেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল,

শিক্ষা বিষয়েও তাহারা পুরোহিতের যথেষ্ট স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল; এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহারা যে শিক্ষকের সমতুল্য ব্যক্তি হইয়া উঠিবে তৎবিষয়ে কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না;—তাহাদের ভাবনা হইয়াছিল কনিষ্ঠ সহোদর ইয়োশিস্তনের জন্য। হায়! সে এমনি নির্ব্বোধ, যে পাঁচবৎসর মঠে, অবস্থান করিয়াও মঠের কোন শিক্ষাই সে কিছুমাত্র আয়ত্ত করিতে পারিল না,—এ হেন নির্ব্বোধ ভাইটীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহারা নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। পুরোহিত মহাশয় যাহাতে এই নির্ব্বোধ ভাইটীকে মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দেন, তজ্জন্য তাহারা বিধিমত চেষ্টা করিত, এবং এই শান্ত বিনম্র বড় ভাই দুইটীর জন্যই পুরোহিত মহাশয় এতদিন ইয়োশিস্তনকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন।

অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্রধারণ ভাবী পুরোহিতের একান্ত অনুচিত কর্ম্ম, কিন্তু ইয়োশিস্তন তৎবিষয়েই অধিকতর অনুরাগী ছিল। আশ্রমে যতক্ষণ থাকে, ভাইয়েরা তাহাকে সে বিষয়ে নিরস্তই রাখে, কিন্তু আজকাল সে বৌদ্ধায়তন পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উক্ত সময় ইয়োশিস্তন প্রান্তরের এক প্রান্তে অরণ্যের মধ্যে "তেঙ্গু" নামক অসীম বলবান এক জঙ্গলী জাতীর নিকট দৈহিক ব্যায়াম চর্চ্চা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিছুকাল গত হইলে ইয়োশিস্তনের দেহ অসুরের ন্যায় বলশালী, প্রস্তরের মত দৃঢ় এবং অস্ত্রনৈপুণ্যে অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিল।

কিছুদিন পরে আশ্রমের সকলেই বুঝিতে পারিল, ইয়োশিস্তনের দেহ আশ্রম অনুচিত দৃঢ় ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার অবয়ব পুরোহিতোচিত শান্ত ও করুণ ভাব অবলম্বন না করিয়া বিকট যোদ্ধার সতেজ উৎসাহপূর্ণ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

'তেঙ্গু' জাপানী দিকড় ইয়োশিৎসুনের শিক্ষক।

আশ্রমের সকলেই বৃদ্ধ পুরোহিতের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া তাপসোচিত ক্ষীণ দেহ-যষ্টিতে বার্দ্ধক্যের ছায়াবিমণ্ডিত একটী করুণ ভাব প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু ইয়োশিস্তন একান্তই পুরোহিত বংশের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া উঠিল. তাহা মনে করিয়া সকলেই ক্ষুব্ধ হইল। তখন ইয়োশিস্তনের বড় দুই ভাই তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাহার পুরোহিত অনুচিত শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"ইয়োশিস্তন, সত্যই তুমি পুরোহিত বংশের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া উঠিলে। তোমাকে ভাই বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হয়—বল তো তুমি এখন কি করিতে চাও?"

ইয়োশিস্তন ধীর স্বরে উত্তর করিল,—"মিনমতো বংশের রক্ত আমার শরীরে প্রবাহিত; আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই বীর বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। পুণ্যকীর্ত্তি মহাবীর মিৎসুনাকার বংশধর কখনই ভীরু বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারে না,—যতক্ষণ একবিন্দু রক্তও আমার শরীরে প্রবাহিত থাকিবে, ততক্ষণ মহাবীর মিৎসুনাকার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পিতা চিরজীবন বীরের মতো যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমিও প্রকৃত পৌরুষত্ব লাভ করিয়া দেশের সেবা ও মঙ্গলের জন্য প্রাণত্যাগ করিব। এখনও তৈরাবংশের রক্তিম পতাকা পিতার অপমান বুকে করিয়া সগর্ব্বে উড়িতেছে—মিনমতো বংশের ধবল পতাকা ধূলি লুণ্ঠিত। মিনমতো বংশের লোকেরা চতুর্দ্দিকে বিতাড়িত হইয়া শত্রু-পদতলে দলিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মরিতেছে। দাদা, এ গৈরিক বসন ফেল, স্বধর্ম্ম ও আত্মগৌরব উজ্জ্বল কর, পিতৃপিতামহদের গৌরব পুনঃ সংস্থাপিত কর। প্রকৃত পৌরুষত্ব লাভ করিয়া দেশ এবং জাতির সেবা করিতে যত্নবান হও।"

ইয়োশিস্তনের কথা শুনিয়া তাহার ভাইয়েরা দাঁত দিয়া জিভ্ কাটিয়া সবিস্ময়ে বলিল,—"ইয়োশিস্তন, তুমি এ কী বলিতেছ? আশ্রম অনুচিত জীব হিংসা তোমার অন্তঃকরণ এমন ভাবে অধিকার করিয়াছে! বুদ্ধদেবের আদেশের অনুসরণ কর। নির্ব্বাণের পথ মুক্ত করিতে যত্নবান হও। তুমি যে কথা উচ্চারণ করিলে, দ্বিতীয় বার কাহারো সমক্ষে এ কথা উচ্চারণ করিলে রাজদ্রোহ অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। সাবধান ইয়োশিস্তন, পাগলামী পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণের পথ অনুসরণ কর, 'মারের' প্রভাব শীঘ্র বিদূরিত হইবে।"

ইয়োশিস্তন কেবল মাত্র বলিল,—"নিষ্কাম দেশ সেবা ও পৌরুষত্ব অর্জ্জনই আমি ধর্ম্ম বলিয়া জানি, সেই ধর্ম্মই আমার এক মাত্র পালনীয়। নির্ব্বাণের অন্ধতম অনুসরণে আমি প্রকৃত পৌরুষত্ব কখনই বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।"

তৎপর দিবস ইয়োশিস্তন আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

পূর্ব্ব ইতিহাস।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে; তখন জাপানে রাজার একচ্ছত্র প্রভাব তিরোহিত; জাপান-সম্রাট প্রজাবর্গের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পূজা-পাত্র রূপে রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করিতেন। সাধারণ প্রজা-বর্গের তাঁহাকে দেখিবার কোন সুবিধা ছিল না, তিনি লোক-নয়নের অন্তরালে থাকিয়া সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেন। প্রকৃত-ক্ষমতা ক্ষমতাপন্ন পরিবারেরা অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। সময় সময় এই রাজক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য প্রতিযোগী দলে ভয়ানক

সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। পরলোকগত মহিয়ান্ জাপান-সম্রাট মাৎসুহিতোর সিংহাসন আরোহণ কাল পর্য্যন্ত জাপানে এ অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা জাপানকে এই ভয়ানক বিপ্লব-বহ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া, সে শক্তি জাতীয় জীবনের অভ্যন্তরস্থ 'বয়লার' রূপ শক্তিকেন্দ্রে সঞ্চিত করিয়া বিপুল শক্তির খরধারা প্রবাহিত করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজক্ষমতালোভী তৈরা ও মিনমতো এই দুই দলে ভয়ানক সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিবাদের ফলে পরস্পর প্রতিযোগী দলের মধ্য অবিশ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাতের অবধি ছিল না।

মিনমতো বংশের ইয়োশিতমো ও তৈরাবংশের কিয়োমরি পরস্পরের দলের নায়ক ছিল। বহুবর্ষ অক্লান্ত যুদ্ধের পর অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ইয়োশিতমোর বহু সংখ্যক সৈন্য হত ও অবশিষ্ট ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। ইয়োশিতমো এক বন্ধু-গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইল। তৈরা ন কিয়োমরি ইয়োশিতমোকে হত্যা করিবার জন্য একদল লোক প্রেরণ করিল। তাহারা কোন ক্রমে ইয়োশিতমোর বন্ধু-গৃহে উপস্থিত হইয়া স্নানাগারে লুকাইয়া রহিল। তথায়ই তাহারা ইয়োশিতমোকে হত্যা করিয়া প্রস্থান করিল।

এই সংবাদ পাইয়া তৈরা ন কিয়োমরি ইয়োশিতমোর বিধবা ও পুত্রদিগকে ধৃত করিবার জন্য লোক পাঠাইল।

বিপদের বন্ধু।

বাহিরে অবিশ্রান্ত তুষার পড়িতেছিল, গাছপালা মাঠ পর্য্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে, ক্ষীণ চন্দ্র-কিরণ তন্মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া ঝক্ ঝক্

করিতেছে। পথে লোক চলাচল অনেক-ক্ষণ বন্ধ। হিমানী শীতল বায়ু একেলা মাঠের উপর প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দ্বিতীয় প্রহরের শেয়াল পর্য্যন্ত স্তব্ধ। একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর বাহিরের ফটক বন্ধ; বাড়ীর অভ্যন্তরে কোন সাড়া শব্দ নাই,—কেবল একটী কক্ষে একটী সুন্দর মহিলা আগুনের ধারে তিনটী শিশুপুত্র লইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়াছিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডলে ভয় এবং উদ্বেগ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলন্ত আগুনের মতো দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। মহিলা বাহিরে দরোজায় সামান্য শব্দ হইলেই অধিকতর ভীত ও চকিত হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু বায়ু বারম্বার বাহিরের দরোজার আঘাত করিয়া ভীত মহিলার আশঙ্কা বৰ্দ্ধিত করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে বাহিরের দরোজায় সজোরে আঘাত হইল, শিকলি "ঠং ঠং ঝণাৎ" করিয়া বারবার নড়িয়া উঠিল। মহিলা ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার শিকলী সজোরে নড়িয়া উঠিল। মহিলা ধীরে ধীরে বাহিরের দরোজার সমীপবর্ত্তী হইলেন। এবার দরোজা ঘন ঘন নড়িতে লাগিল।

মহিলা গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"কে, ইয়োশিতমো?" বাহির হইতে অপরিচিত কণ্ঠে উত্তর আসিল,—"না, ইয়োশিতমো নহি, দরোজা খোল, জরুরী কাজ—খুব জরুরী।"

ভিতর হইতে মহিলা উত্তর করিলেন,—"বাহিরের শীতে কষ্ট হইয়া থাকিলে ভিতরে এস; আর অন্য কোন জরুরী সংবাদ থাকিলে ঐ স্থান হইতে বলিতে পার। বিশেষ কার্য্য গতিকে কোন অপরিচিতকে আজ স্থান দিতে অক্ষম। প্রথম শুনিতে চাই তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল,—"পরিচয় লইয়া চিনিতে পারিবে

না। তোমার মিত্র ভাবেই আসিয়াছি। তোমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত !”

মহিলা উত্তর করিলেন,—“বিপদের জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়াই আছি।”

বাহিরের ব্যক্তি বলিল,—“বিপদ ঘনীভূত, রক্ষা পাইতে চাও ত এখনও সতর্ক হও। কল্য ইয়োশিতমো তৈরাদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছে। তোমাকে ধৃত করিবার জন্য সৈনিক প্রেরিত হইয়াছে। পুত্রসহ তুমি তৈরাদিগের নিষ্ঠুর অস্ত্রের ব্যবহার্য্য হইবে।”

মহিলা উত্তর করিলেন,—“তুমি কে ?”

বাহিরের ব্যক্তি বলিল,—“আমিও তৈরাসৈনিক ; তোমাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট শপথ করিয়াছি।”

মহিলা দরোজার অর্গল মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন,—“এস আমার গৃহে। ছলনায় কোন্ প্রয়োজন ? শত্রু নিপাতের জন্য আসিয়া থাকিলে এখনই তাহা সম্পন্ন কর।”

সৈনিক গৃহে প্রবেশ করিয়া নতজানু হইয়া বলিল,—“মাননীয়া, আমি আপনার উদ্ধারের জন্যই আসিয়াছি। শত্রু ভাবে আসি নাই। যদি আপনি কিয়োমরির নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে চান, বিলম্ব না করিয়া অতি সত্বর এই গৃহ পরিত্যাগ করুন। বাহিরের তুষার বর্ষণ দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না।”

মহিলা শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন,—“সত্যই তুমি আমাকে বাঁচিতে বল ?”

সৈনিক পুরুষ ধীর স্বরে উত্তর করিল,—“ইয়োশিতমোর মহৎ বংশ কি আপনি লুপ্ত করিতে চান ? সত্বর এই সমস্ত শিশুদিগকে

গরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া গৃহের বাহিরে আসুন। অত্যল্প কাল মধ্যেই তৈরা সৈনিক বৃন্দ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে।”

মহিলা ইয়োশিতমোর বিধবা স্ত্রী তকিও। তকিও একখানি শাণিত ছুরিকা কটিদেশে লইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র ইয়োশিস্তনকে বুকে লইয়া অন্য দুটী পুত্র সহ সৈনিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিয়া তুষারাচ্ছন্ন নির্জ্জন পথে নিঃশব্দে অতি কষ্টে চলিতে লাগিলেন।

জালে বদ্ধ।

তকিও ও তাঁহার পুত্রগণ ধরা পড়িল না; তৈরা ন কিয়োমরি সবিশেষ চিন্তিত হইল। এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র তাহাদের অনুসন্ধানের জন্য চর প্রেরণ করিল; জীবিত কিম্বা মৃত অবস্থায় যে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তৈরা ন কিয়োমরি তাহাকে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিয়া জায়গীর প্রদান করিবে; কিন্তু কিছুতেই তকিও ও তাঁহার পুত্রগণের কোন সন্ধান মিলিল না। অগত্যা তৈরা ন কিয়োমরি তকিওর বৃদ্ধা মাতাকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিল এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিল, “যদি এক মাসের মধ্যে তকিও স্বেচ্ছায় যাইয়া ধরা না দেয়, তবে তকিওর মাতার মুণ্ডই কর্ত্তিত হইবে।”

নির্জ্জনে থাকিয়াও তকিও এ সংবাদ অবগত হইলেন এবং আর লুকাইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া মাতার উদ্ধারের জন্য পুত্রদিগকে সঙ্গে লইযা কিয়োতো’সহরে তৈরা ন কিয়োমরির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঈশ্বরের কি বিচিত্র বিধান! যাঁহাকে জীবিত কিম্বা মৃত অবস্থায় ধৃত করিবার জন্য কিয়োমরির সহস্র অনুচর শাণিত তরবারি কটিদেশে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, যাঁহাকে বিনাশ করিবার

জন্য কিয়োমরির সহস্র চেষ্টার অবধি ছিল না, আজ তাহাকে দেখিয়া কিয়োমরি মোহিত হইল। অন্ধ মোহ! তকিওর অপরূপ মনোমোহন সৌন্দর্য্যে কিয়োমরি একেবারে বশীভূত হইয়া পড়িল।

তকিওকে বধ্যভূমিতে নেওয়া দূরে থাক, কিয়োমরি তকিওকে বিবাহ করিবার জন্য সবিশেষ লালায়িত হইল।

তকিও প্রথমে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না; তৎপর মাতা ও পুত্রগণের জীবন রক্ষার্থ কিয়োমরির প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন।

কিয়োমরি যদিও তকিওকে বিবাহ করিল, তথাপি তকিওর পূর্ব্ব সন্তানগণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বিরত হইল না। তাহারা কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কিয়োমরি সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবার সম্ভাবনায় তকিওর পুত্রদিগকে অহিংসাময় পুরোহিতবৃত্তি অবলম্বন করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধায়তনে প্রেরণ করিল।

দেশ পর্য্যটনে।

তৎকালে জাপানের রাজধানী ছিল কিয়োতো সহর। ইয়োশিস্তন রাজধানী হইতে বহুদূরে পূর্ব্বদিকে কারজুসা নগরে গমন করিল; সর্ব্বত্রই সে মিনমতো বংশের লোকের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া নিরতিশয় সন্তপ্ত হইল। তৎকালে একজন লৌহ-বণিক তাহার সহযাত্রী ছিল। কারজুসা নগরে উপস্থিত হইয়া ইয়োশিস্তন উক্ত সহরের অধিবাসীবৃন্দের ভয়ানক দুর্দ্দশা অবলোকন করিল। এই স্থানটী রাজধানী হইতে বহু দূরে, কাজেই তাহার নিষ্প্রভ শাসন কার্য্যের সুযোগে দুর্দ্দান্ত দস্যুরা অধিবাসীবৃন্দের ধন প্রাণ অপহরণ করিয়া লইত। একদিন ইয়োশিস্তন একাকী পাঁচ জন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে নিহত করিয়া ভয়াতুর নগরবাসীদিগকে বিপন্মুক্ত করিল। তৎপর

আর একদল প্রবল পরাক্রান্ত দস্যুকে নিরস্ত্র আক্রমণ করিয়া আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া সমস্ত সহরবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিল। বণিকটী তাহার সঙ্গীর এবম্বিধ সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া ভীত ও ভবিষ্যৎ বিপদ আশঙ্কায় চিন্তান্বিত হইয়া ইয়োশিস্তনকে এই প্রকার সাহসিক কার্য্য হইতে বিরত হইতে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিল, নচেৎ কোন দিন তাহার কার্য্যকলাপ কাহিনী "সেগুনের" কর্ণগোচর হইলে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। ইয়োশিস্তন সে কথায় কিঞ্চিন্মাত্র কর্ণপাত না করিয়া চোহান নামক আর একটী দুর্দ্দান্ত দস্যুর প্রাণ বধ করিল।

ইয়োশিস্তন সে স্থান হইতে উত্তর দিকে ওশিও নগরে গেল। সেখানে তাহার অদ্ভুত দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিল।

ইয়োশিস্তন মস্তবংশের প্রভু হিদেহীরার রাজ্যে উপনীত হইলে হিদেহীরা তাহাকে নিজ আলয়ে অত্যন্ত আদর আপ্যায়িত করিয়া রাখিল। সেইস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ইয়োশিস্তন জাপানে তৎকাল প্রচলিত সমুদয় যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রনৈপুণ্য আয়ত্ত করিল।

ইহার কিছুদিন পরে বেন্‌কী নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ ও দুর্দ্দান্ত দস্যু সে নগরে আগমন করিল; তাহার অমানুষিক শক্তি ও বিশাল দেহ এবং দস্যুচিত নৃশংস ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া সহরবাসী সকলেই ভীত হইল। এ পর্য্যন্ত কেহই বেন্‌কীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার আকৃতি দেখিলে সকলেই ভয় পাইত। এ পর্য্যন্ত বেন্‌কী বহু যোদ্ধাকে পরাস্ত করিয়া এবং বহু যোদ্ধার মুণ্ড তরবারি আঘাতে স্কন্ধচ্যুত করিয়া বিজয় চিহ্ন স্বরূপ পরাজিত শত্রুর তরবারিখানি পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া লইয়াছে;—এই

প্রকারে তাহার পৃষ্ঠদেশে তৎকালে ৯৯৯ খানা তরবারি ঝুলিতেছিল। ইয়োশিস্তন একখানি তরবারি লইয়া এই বিকট যোদ্ধার সম্মুখবর্ত্তী হইল। বেন্‌কী তাহাকে নিতান্ত বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক দূরে সরিয়া যাইতে অনুজ্ঞা করিল। ইয়োশিস্তন নিতান্ত স্পর্দ্ধাপূর্ণ স্বরে বেন্‌কীকে আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিল। বেন্‌কী বারম্বার স্বীয় দীর্ঘ তরবারি দ্বারা ইয়োশিস্তনকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ইয়োশিস্তন স্বীয় ক্ষুদ্র তরবারি দ্বারা বেন্‌কীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে বেন্‌কীকে নিরস্ত্র ও ভূপাতিত করিল এবং বেন্‌কীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবার সুবিধা সত্বেও ইয়োশিস্তন তাহাকে ক্ষমা করিয়া জীবন দান করিল।

বেন্‌কী ইয়োশিস্তনের এবম্বিধ মহত্ত্ব ও উদারতা দর্শনে মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেইদিন হইতে বেন্‌কী ইয়োশিস্তনের একান্ত অনুরক্ত ও ভক্ত শিষ্যরূপে পরিগণিত হইল।

বেন্‌কী বাল্যজীবনে পৌরোহিত্য-বৃত্তি শিক্ষার নিমিত্ত কোন আশ্রমে প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে তাহার শারীরিক শক্তি ও দুর্দ্দান্ততার পরিচয় পাইয়া সকলে তাহাকে "ছোট দস্যু" বলিয়া ডাকিত। কিছুদিন পরে বেন্‌কী মঠ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের দেশের "শিখ নিহাঙ্গের" মতো নানা স্থানে যুদ্ধ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে তাহার এ অবস্থাও ভাল লাগিল না। তৎপরে সে রীতিমত দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অত্যাচার করিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

বেন্‌কীর নাম শুনিলে অতি বড় যোদ্ধাও ভয়ে থরহরি কম্পিত

হইত; কিন্তু ক্ষুদ্র ইয়োশিস্তনের নিকট পরাজিত হইয়া তাহার জীবন নূতন পথে ধাবিত হইল।

স্বদেশ হিতব্রতে বেন্‌কী একান্ত মনে আত্মনিয়োগ করিল।

স্বদেশ ব্রতে।

ইয়োশিস্তনের পুরোহিত দুই ভাই ব্যতীত বৈমাত্রেয় আর এক জন বড় ভাই ছিল, তাহার নাম ইয়োরিতমো। তাহাদের পিতা ইয়োশিতমোর মৃত্যুর পর ইয়োরিতমোই পিতার "সেগুন" বা রাজপ্রতিনিধি পদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল; কিন্তু তৈরাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ন কিয়োমরির ষড়যন্ত্রে ইয়োশিতমো যখন প্রাণত্যাগ করিল, তখন ইয়োরিতমোকেও কিয়োমরির লোকেরা ধরিয়া লইয়া গেল। ইয়োশিতমোর মৃত্যু-দণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বে কিয়োমরির এক বিমাতা ইয়োরিতমোকে স্বীয় মৃত পুত্রের অনুরূপ চেহারা প্রত্যক্ষ করিয়া কিয়োমরির নিকট তাহার জীবন ভিক্ষা চাহিয়া লইল, এবং তাহাকে স্বীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া রাজধানী হইতে বহুদূরে একদ্বীপে যাইয়া বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কিয়োমরির অত্যাচারে দেশের লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিল, এমন কি, মিকাদো রাজবংশের লোকেরা পর্য্যন্ত কিয়োমরির যথেচ্ছ ব্যবহারে এতদূর প্রপীড়িত হইল যে গোপনে তাহারা তৈরা বংশের পতন কামনা করিতে লাগিল। রাজবংশের লোকেরা গোপনে চতুর্দ্দিকে মিনমতো বংশের লোকের নিকট সংবাদ পাঠাইতে লাগিল; ইয়োশিস্তনের অদ্ভুত বীরত্ব কথা তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাহারা ইয়োশিস্তন এবং ইয়োরিতমো উভয়কেই দেশের এই সঙ্কটের সময় আহ্বান করিল। স্থানে

স্থানে মিনমতো বংশের লোক একত্রিত হইতে লাগিল। ইয়োরি-তমো ও ইয়োশিস্তন পূর্ব্ব ও উত্তর দিক হইতে কতক সংখ্যক লোক লইয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; ক্রমে নানা-স্থান হইতে লোক আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। তৎসঙ্গে কিয়োমরির অত্যাচার প্রপীড়িত অন্য বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

তৈরাদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধে ইয়োরিতমো ও ইয়োশিস্তনের সৈন্যদল পরাজিত হইল। ইয়োরিতমো স্বীয় সেনাবলসহ দেশের উত্তর কোণে যাইয়া আশ্রয় লইল; কিয়োমরি বিপুল সেনাদল লইয়া একেবারে এই বিদ্রোহীকে চূড়ান্ত রূপে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সজ্জিত হইল, কিন্তু কিয়ৎদিবসের মধ্যেই তাহার আত্মা মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল, কিন্তু মৃত্যুসময়েও কিয়োমরি সেনাপতি-দিগের বিশেষরূপ উপদেশ দিয়া গেল যেন তাহার মৃত্যুর পরে ইয়োরিতমোর মস্তক আনিয়া স্বীয় কবরের উপর ঝুলাইয়া দিয়া তাহার তৃষিত আত্মার তৃপ্তি বিধান করে।

ইহার অত্যল্পকাল পরেই ইয়োশিস্তন একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল, এ সময় ইয়োরিতমো আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার সঙ্গে যোগ দিল।

কয়েকটী যুদ্ধে তৈরাগণ বারম্বার পরাজিত হইয়া তাহাদের স্বীয় নগরী ফুকুহারাতে সৈন্যদল সন্নিবেশিত করিল। তৈরাদিগের প্রচণ্ড চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইয়োশিস্তন ও ইয়োরিতমোর সৈন্যদল নগরে প্রবেশ করিল। কিয়োমরির পুত্র মুনেমুরি স্বীয় পরাজিত সৈন্যদলসহ অন্যত্র প্রস্থান করিল।

ফুকুহার জয়ের পর ইয়োরিতমো তথায় "সেগুন" পদে প্রতিষ্ঠিত

হইল। ইয়োশিস্তন সৈন্যদল লইয়া মুনেমুরির পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ইয়োশিস্তনের উপযুক্ত সহকারীদ্বয়—বেন্‌কী ও সাবরু সর্ব্বত্র অদ্ভুত যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করিল। মুনেমুরির সৈন্যদল আরো দুই স্থানে পরাজিত হইল, তৎপর তাহারা সৈন্যদল লইয়া শিমোনসেকি অন্তরীপে প্রস্থান করিল; ইয়োশিস্তন তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেখানে যাইয়াও উপস্থিত হইল। অনন্তর নিরুপায় হইয়া মুনেমুরি ও তাহার সৈন্যদল "ডাল ন উরা" নামক স্থানে ভীষণ জলযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এই স্থানে ইয়োশিস্তনের সহিত যুদ্ধে মুনেমুরি ও তাহার সমস্ত সৈন্য সাতশত তরণী সহ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল। তাহাদের একটী তরণীতে জাপানের বালক সম্রাট ও তাহার মাতা—কিয়োমরি ও কোহিক্রার গর্ভজাত সন্তান, এবং সম্রাটের মাতামহী কোহিকো ছিলেন। জলযুদ্ধে প্রাণরক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কোহিকো বালক সম্রাটকে বুকে করিয়া সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপ দিলেন।

"ডাল ন উরা" যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ও শত্রুকুল সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিয়া ইয়োশিস্তন সৈন্যবলসহ ভ্রাতার সম্বর্দ্ধনার্থ ফুকুহার যাত্রা করিল। পথিমধ্যে বহুসংখ্যক লোক তাহার সাদর অভ্যর্থনা করিল। ইয়োশিস্তনের যুদ্ধনৈপুণ্য ও অদ্ভুত বীরত্ব সমস্ত জাপানের আদর্শ স্বরূপ হইল। সকলের মুখেই তাহার দেবোচিত অসীম যুদ্ধ-নৈপুণ্যের কথা পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

ইয়োশিস্তনের এই প্রকার প্রশংসা একজনের অন্তঃকরণে সন্দেহের উদ্রেক করিল,—সে ইয়োশিস্তনের বৈমাত্রেয় ভাই "সেগুন" ইয়োরিতমো। সেগুনের একজন দুষ্ট মন্ত্রী কোজিওয়ারার কুমন্ত্রণায় সেগুনের মন সন্দেহে আকুল হইল, এবং মনে করিল ইয়োশিস্তনের

মনে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া সেগুন পদ অধিকারের উচ্চাভিলাষ লুক্কায়িত আছে।

ইয়োশিস্তন বিজয়লব্ধ প্রসাদ ভ্রাতার চরণে অর্পণ করিবার নিমিত্ত ফুকুহার নগরীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। তখন ইয়োরিতমো ইয়োশিস্তন ব্যতীত সমস্ত সৈন্যের নগরে প্রবেশাধিকার প্রদান করিল। সেগুনের আদেশ অপেক্ষায় ইয়োশিস্তন অত্যল্প সৈন্যসহ নগরীর বাহিরে অবস্থান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইয়োরিতমো ইয়োশিস্তনকে হত্যা করিবার আদেশ সহ একদল লোক প্রেরণ করিল। বেন্‌কী এই সংবাদ অবগত হইয়া পথিমধ্যেই সেই লোকদিগকে হত্যা করিল। ইতঃপর উভয় ভ্রাতায় প্রকাশ্য বিবাদের সুত্রপাত হইল।

ইয়োশিস্তন গভীর অশ্রুপূর্ণ ভাষায় ইয়োরিতমোর অন্য এক মন্ত্রী হিরোমতোকে, তাহার বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত স্বদেশের উদ্ধারের নিমিত্ত যতপ্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সমুদয় লিখিয়া পরিশেষে লিখিল,—"আমার পূজ্যতম ভ্রাতা সেগুন মহাশয় কনিষ্ঠের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া যেন তাহাকে পূর্ব্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে যত্নবান হন। আমি আমার ভ্রাতা কিম্বা দেশের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট চিন্তা করি নাই।" ইয়োরিতমো এই সমস্ত কোন কথায়ই কর্ণপাত না করিয়া দেশের একনিষ্ঠ সেবক ইয়োশিস্তনের প্রাণ সংহারের জন্য নানা আয়োজন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সম্রাটের মোহরাঙ্কিত এক পত্র ইয়োশিস্তনের হস্তগত হইল। এই পত্রে সম্রাট ইয়োশিস্তনকে সেগুন পদ প্রদান করিয়া দেশে শান্তি ও সুমঙ্গল স্থাপনের জন্য আদেশ দিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য ইয়োরিতমোর পদচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইয়োশিস্তন এই পত্র দেখাইয়া সমস্ত সৈন্যবর্গকে আহ্বান করিল। ইয়োরিতমো সে সময় সমস্ত রাজ ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া প্রচুর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল; সে তৎক্ষণাৎ রাজ মোহর যুক্ত আর এক পরোয়ানা বাহির করিয়া ইয়োশিস্তনের সমস্ত কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল ও তৎসঙ্গে সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত ইয়োশিস্তনের হত্যার আদেশ বাহির করিয়া সৈন্য ও সাধারণ প্রজাবর্গকে ইয়োশিস্তনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও তাহার হত্যার বিনিময়ে বিপুল রাজবৃত্তির প্রলুব্ধ ঘোষণা প্রচার করিল।

ভ্রাতৃবিরোধে আর ইন্ধন না জ্বালাইয়া ইয়োশিস্তন কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সহ হিদেহিরার রাজ্যে গমন করিল। তথায় ৪ বৎসর সে পুত্র কন্যা লইয়া নির্বিঘ্নে অবস্থান করিল। হিদেহিরা জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তৎপ্রতি বিশ্বস্ত ছিল; কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ ইয়োরিতমোর চক্রান্ত জালে বিজড়িত হইল, তাহারা ইয়োরিতমোর অধিক রাজ্য পুরস্কার লোভে ইয়োশিস্তনকে ধরাইয়া ইয়োরিতমোর নিযুক্ত হত্যাকারীদের হস্তে সমর্পণের ইচ্ছা করিল। একদিন হিদেহিরার পুত্রগণ ইয়োশিস্তনকে শিকার খেলিবার জন্য আহ্বান করিল। ইয়োশিস্তন সজ্জিত হইয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে তদীয় বিশ্বস্ত অনুচরেরা হিদেহিরার পুত্রগণের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ অবগত করাইল। ইয়োশিস্তন উত্তর করিল,—"মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, ঘরের ভিতর কিম্বা বাহিরে, মৃত্যু সর্ব্বত্র সমান;—তবে পুরুষের মতো মৃত্যুই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত জীবনের পরিচায়ক।"

ইয়োশিস্তনের বিশ্বস্ত অনুচরেরা সকলেই সম্মুখ সংগ্রামে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল। ইয়োশিস্তনের সতীসাধ্বী স্ত্রী

বেণ্কাইর সহিত ইয়োশিৎস্থনের যুদ্ধ।

স্বামীর বিপদ সময়ে কিছুতেই স্বামীর পার্শ্ব পরিত্যাগে স্বীকৃত হইল না। অতএব পরিবারস্থ সকলেই আত্ম-রক্ষার বন্দোবস্ত করিয় শত্রুর আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিল।

এই প্রকারে দু'দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিবসে এক সৈন্য বাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। এই সৈন্যদলে হিদেহিরার বিশ্বাসঘাতক পুত্রগণকে অগ্রবর্ত্তী না দেখিয়া এবং ইহা দেশপতির নিয়োজিত সৈন্যদল মনে করিয়া ভ্রাতার নিকট আত্ম-সমর্পণ অভিলাষে ইয়োশিস্তন অস্ত্র ধারণে অস্বীকৃত হইল, কিন্তু ইয়োশিস্তনের বিশ্বস্ত ষোল জন অনুচর প্রভুর জীবন রক্ষার দৃঢ় সংকল্পে একটী সঙ্কীর্ণ পথে উক্ত বিশাল সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল। এ দিকে ইয়োশিস্তন শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে বৌদ্ধ সূত্র সকল পাঠ করিতে লাগিল, তদীয় স্ত্রী নিদ্রিত পুত্র-টীকে কোলে লইয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সেই উপাসনায় যোগ দিল।

উক্ত যুদ্ধে বেনকী ও সাবরু ব্যতিত ইয়োশিস্তনের সমুদয় অনুচরই নিহত হইল। তথাপি যুদ্ধের বিজয় ফল তাহাদেরই হস্তগত হইল।

সেই দিনই ইয়োশিস্তন বেন্‌কী ও সাবরু সহ ইজো অন্তরীপে আগমন করিল, তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর একটী তরণীতে আরোহণ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম সমুদ্র পারের বিস্তৃত ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইল।

বিদেশে।

১১৫৯ খৃষ্টাব্দে ইয়োশিস্তন জন্মগ্রহণ করে। তাহার কিঞ্চিন্যূন ৩২ বৎসরের সময় ভ্রাতা ও স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রপীড়িত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া চীনভূখণ্ডের প্রান্তদেশ অবতরণ করিল। তথায় স্বীয় সৈন্য সহায়তায় এক বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার

করিয়া ফেলিল, এবং স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ মহাবীর মিৎসুনাকার নামে ঐ স্থানের নাম মাঞ্চু বা মিৎসুনাকা রাখিল। জাপান হইতে আগত সৈন্যদলের,—নিহনজিন বা প্রভাত সূর্য্যের দেশের লোকের সহায়তায় ইয়োশিস্তনের রাজ্যায়তন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মাঞ্চুরিয়ায় শান্তি ও সৌভাগ্য স্থাপন করিয়া ইয়োশিস্তন এক বিরাট সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইল। অব্যবস্থচিত্ত ও নিরন্তর বৈদেশিক জাতিকর্ত্তৃক বিদলিত ভ্রমণশীল মোগলগণ ইয়োশিস্তনের সদিচ্ছায় পরিচালিত হইয়া এক বিরাট প্রতাপান্বিত জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইয়োশিস্তন চীনের বিশাল রাজশক্তি খর্ব্ব করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত এসিয়া জয় করিয়া ফেলিল। এবং তাহার বিজয় বাহিনী য়ূরোপে প্রবেশ করিয়া রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইল। চীনের উপকূল হইতে স্পেনের প্রান্তসীমা এবং ভারতবর্ষ হইতে রাশিয়ার অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত ইয়োশিস্তনের বিজয় বীরদাপে কম্পিত হইতে লাগিল। মোগল, তুর্ক, পাঠান, ইরাণ, এই চারি জাতি ইয়োশিস্তনের অধীনতায় আগমন করিল।

* * * *

দিগ্বিজয়ী মহাবীর ইয়োশিস্তনের মৃত্যুর পর তাহা হইতে কয়েকটী প্রবল প্রতাপান্বিত রাজবংশের সৃষ্টি হইল। তাহার পুত্র চতুষ্টয় তাহার বিশাল সাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লইল। প্রায় দুই শত বৎসর কাল এই সকল রাজন্ব স্বীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

লাহোর

ভাদ্র, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

প্রেমের কবর

সেই "ভরা ভাদরের" মোহমাধুরীধারাপূরিতঅশ্রুভরাকরুণার কোমল আঁচল মুড়ে শ্রান্ত শিশুটীর মতো রবিকর রেখা ঘুমে অচেতন ; বন-মর্ম্মরে ব্যথা লীলায়িত ; তৃষাদীর্ণ ধরণীর মলিন ছবি শ্যামল রূপে ঝলসিত ; বৃষ্টিধারে ফুলের মধু ধুইয়া যাওয়ায় ভ্রমরের গুঞ্জন নীরব ও আলোর সাথী প্রজাপতির নৃত্য আস্ফালন বিরত,—শুধু বুলবুল বনকুঞ্জে আপনার গানে "মস্‌গুল" ;—পক্কশ্রী আনারের চিক্কন গণ্ড-স্থল বুঝি সেই প্রণয় গানে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে ! বনকুঞ্জ গুচ্ছ গুচ্ছ আনারের ভারে অবনত হইয়া ঘন পত্রপল্লবজালের মধ্যে আপনার অনিন্দ্য যৌবনশ্রীটীকে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে ! বুলবুল কুঞ্জ-বনের কানে কানে গুঞ্জরিয়া লজ্জারুণ আনারের কোমল গণ্ডে বারম্বার আঘাত করিয়া সুমিষ্ট রসে তৃষ্ণা মিটাইয়া প্রেম-মদির কণ্ঠের করুণ সঙ্গীতে অশ্রুবিন্দুবিগলিত শূন্য আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে ;—যেন মনে হয়, বেদনা প্রেমের অবিচ্ছেদ-সঙ্গী—দুইজন পরস্পর এক অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত,—এক বৃন্তে দু'টী কুসুম ।

লাহোরের "গুলবাগের" সন্নিকটে আনার-কুঞ্জের এক পার্শ্বে একটী বিশাল সমাধি-গুম্বজ দূর হইতেই পরিদৃষ্ট হয়, তাহার অভ্যন্তরে প্রকোষ্ঠ মধ্যে সুদৃশ্য একখানি তুষারধবল মর্ম্মর পাথরে প্রাণপণ যত্নে চিত্রিত নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিত দৃষ্ট হয় ;—

"আগর্ মন্ বাজ বাইনাম্ রিউ ইয়ার-ই-খেশ রা।
তা কেয়ামৎ শুকর্ গোয়াম্ কিরদিগার-খেশ রা॥"

হায়! যদি ক্ষণেকের তরে,
আর একবার ফিরে
পাইতাম দেখা কভু সেই হারাণ সখার,
খোদা! রাখিতাম হৃদে করি
এই কৃতজ্ঞতা ভরি
শেষ-বিচারের দিন যবে আসিত আমার।

এই স্মৃতি-ফলকের গভীর মর্ম্মবেদনামাখা কথাগুলির মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইলে অতীত দিনের নৈরাশ্য-জড়িত কোন অশ্রুসিক্ত ঘটনার মর্ম্মর নিঃশ্বাস আমাদের প্রাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনার দাগ আঁকিয়া দেয়; ঘটনার স্মৃতি সুদূর হইলেও কোন মায়াময় অনুভব-মন্ত্রে আমাদের অন্তর্চক্ষুর সমক্ষে কুণ্ঠিত ফুলবাসের মতো নীরব প্রেমের ছবি ও তৎপার্শ্বে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুপ্লুত রেখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে;—ইহাই আমাদের বর্ণনীয় ঘটনার রহস্যভূত মর্ম্ম।

* * *

বাদশাহের "হেনার" বাগান আজ পরিপূর্ণ,—ফুলের গন্ধে আর বুলবুলের গানে! হাস্‌না গাছের হাজারো আঁখি এক সঙ্গে ফুটে উঠেছে—চাঁদের আলোর গোপন মন্ত্রে! বাগানের আলোছায়ার মখমল মোড়া স্থানের উপর মৃদু পা ফেলে ঘুরে বেড়াইতেছিলেন—তরুণ শাহজাদা; গায়ে তাঁহার সোনার বুটা দেওয়া ফিরোজা রঙের কুর্ত্তা, পায়ে সোনার জরি মোড়া চটি, কটিতে হীরার ধারের মিশরী ছুরি, মুখে বেদনা মাখা কেমন চিন্তান্বিত ভাব। ক্ষণেক এদিক ওদিক পরিভ্রমণের পর বাগানের এক কোণে কুঞ্জ-অন্তরালে একটী ক্ষুদ্র মর্ম্মর বেদিকার উপর শাহজাদা উপবেশন করিলেন।

চাঁদ দিগন্ত রজত জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া বনের মাথার উপর আসিল। শাহজাদা লক্ষ্যহীন দৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। ক্লান্ত বুলবুল কুঞ্জবনে ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নভোর পাখীর দু'একটী মধুস্বর রাত্রির পাঁশুর মুখে চুম্বন ধ্বনির মতো বাজিয়া উঠিতেছিল! শাহজাদা উঠিলেন না—সেই খানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে কি চিন্তায় তাঁহার মুখ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—একদিনের ছবি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। সে এমনি নির্জ্জন রাত্রি,—বনান্তরালে চাঁদ হেলিয়া পড়িয়াছিল। শাহজাদা অনিদ্রা প্রযুক্ত বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। দেখিলেন—ইরাণীবাঁদী বালিকা আনারকলি তাহার উৎফুল্ল কুসুমগুচ্ছ তুল্য হৃদয়-অর্ঘ্য এই মর্ম্মর বেদিকায় লুটাইয়া দিয়া ঘুমাইতেছে। চুম্বন-ওষ্ঠ পাথরে মিলাইয়া বালিকা যেন একান্ত আগ্রহে এই পাষাণ বেদিকাকে আপনার প্রাণের সঙ্গী করিয়া লইয়াছে। নৈশবায়ুর শীতল নিঃশ্বাস বালিকার অঙ্গে নিপতিত হইতেছে, কিন্তু তাহার একান্ত তন্ময়তা কিছুতেই ভঙ্গ হইতেছে না। এই মর্ম্মর বেদিকার চতুর্দ্দিক সৌরভসিক্ত অজস্র পুষ্পস্তবকে সুসজ্জিত,—যেন কোন অজ্ঞাত হৃদয়ের মর্ম্ম-বেদনা তরুণ প্রেম রঞ্জিত হৃদয়ের সুরভি সিক্ত হইয়া প্রেমাস্পদের শুভ্র দিব্যকান্তি আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে!

বালিকার কর বিন্যস্ত একটী কাগজের প্রতি শাহজাদার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি বিস্ময়ান্বিত ভাবে কবিতাটী পাঠ করিলেন,—

"গুফ্‌তাম আজ এশ্‌কে বুতা আয়
দিলচে হাসেল কারদাই।
গুফত মারা হাসেল জুজ নাল
হায়ে হার নিস্ত॥"

—আমি কৌতুকচ্ছলে মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—রে মন! তুই কেন লোককে ভালবাসিস্? মন উত্তর করিল—আমি কাঁদিতে ভালবাসি, তাই ভালবাসি। না কাঁদিলে ভালবাসিতে পারা যায় না। যাহাকে চিরদিন কাছে পাওয়া যায় তাহার জন্য কান্না আসে না। যাহার জন্য চোখের জল ফেলিতে হয়—তাহাকে পাইলেই অনন্ত সুখ। সেই জন্য—অশ্রুই মিলনের সেতু। আমি মনের কথার প্রতিধ্বনি লইয়াই জানাইতেছি, আমি তোমায় ভালবাসি কেবল কাঁদিবার জন্য। তোমার জন্য আজীবন কাঁদিতে পাইলে আমি তোমায় পাইব, এই আশা আমার মনে জাগিয়া উঠে।

শাহজাদা এই কবিতার ছত্রে ছত্রে বালিকার আকুল হৃদয়ের মর্ম্মবেদনা অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করিলেন। কে বালিকার প্রাণপুষ্প অর্ঘ্যের দেবতা!

যুবরাজ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই কবিতার নিম্নে এই কয়েকটী কথা লিখিলেন,—

"পেশ আহলে দিদা কারুকে
দারগুল ও দারখার নিস্ত।"

—লোকে সুখ ও দুঃখ স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করে বলিয়া এত কষ্ট পায়। আমি সুখ এবং দুঃখকে এক পদার্থ বলিয়া ভাবি। কারণ এই একটী গোলাপ ফুল—তাহাতে কাঁটা আছে, সুবাস আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কেশর আছে,—সকলগুলির সমষ্টিই গোলাপ।

ইরাণীবালিকা আনারকলি জানিত, শাহজাদা প্রত্যহ এই কুঞ্জ প্রান্তের নির্জ্জন মর্ম্মর বেদিকায় আসিয়া উপবেশন করেন। অপরাহ্ন রবির চূর্ণ আবিরকররেখা বৃক্ষকুঞ্জের মধ্য দিয়া আসিয়া শাহজাদার অরুণ মুখে কমনীয়রূপের জ্যোতি মাখিয়া দেয়। বালিকা এখানে

আসিয়া প্রত্যহ শাহজাদার হাতে বৈকালিক সরবৎ ও মিষ্ট আনার রস প্রদান করে। স্বচ্ছ কাচের পাত্রে ঈষৎ রক্তআভাযুক্ত ওষ্ঠ-লগ্ন আনারের রস ও বৈকালিক রশ্মির অপূর্ব্ব মহিমা জড়িত শাহজাদার হাস্যদীপ্ত কমনীয় জ্যোতি মিলিয়া কি অপূর্ব্ব সুষমা ও বালিকার সঙ্কোচ-কাতর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে কি লীলা-রহস্য উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিত, প্রেম দেবতার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। এই বালিকা প্রত্যহ নিশীথ রাত্রির নীরবতার মধ্যে এই মর্ম্মর বেদিকার পাদমূলে বসিয়া সমগ্র হৃদয়ের প্রেমাপ্লুত নয়ন-বারিদ্বারা কোন্ দুর্লভ প্রেম-দেবতার তপস্যা করিত—কেহ জানিত না!

* * *

এক দিন নিশীথ রাত্রির নির্জ্জনতার মধ্যে রূপোন্মত্ত রাজভৃত্য দিলদার যখন এই বালিকার নিষ্কলঙ্ক যৌবন কলঙ্কিত করিবার আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিল, তখন বালিকা দীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো গর্জ্জিয়া সেই ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিল,—"জানিস্ না কুকুর! আমি বিবাহিতা, আমার স্বামী স্বর্গের দেবতা! বাদশাহকে বলিলে এখনই তোর প্রাণদণ্ড হইবে!"

দিলদার ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইয়া স্বীয় ক্রূর সংকল্প মনের মধ্যে গোপন রাখিয়া বালিকার পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবনে সে আর কখনো এমন হীন সংকল্প মনে স্থান দিবে না। সজল নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বালিকার ক্ষমার পাত্র হইয়াছিল।

* * *

আজ আনার স্বপ্নে দেখিল, তাহার নিষ্কলঙ্ক প্রেমদেবতা প্রার্থিত বর লইয়া শিয়রে আসিয়া দণ্ডায়মান!

আনারকলি প্রেমপুলকে জাগরিত হইয়া যাহাকে দেখিল তাহা তাহার স্বপ্নকল্পনারও অতীত; দেখিয়া বিস্ময় মুগ্ধ ও আধ স্বপ্ন-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"কে তুমি?—স্বর্গের দেবতা! দূরে ছিলে সেই ভাল ছিল, কেন এই নিষ্ঠুর বাস্তব রাজ্যে—এত নিকটে ধরা দিতে এলে,—একি আমি কখনো সহ্য করতে পারবো! প্রখর সূর্য্যালোক—তাহা দূরের হইয়াই আশা এবং আনন্দের উৎস স্বরূপ হইয়াছে। সেই সুদূর করুণা নিকটে এলে যে তাহা ধ্বংসের জ্বলন্ত ঝটিকা ছড়িয়ে দেবে!"

শাহজাদা বিস্ময় জড়িত ও কৌতুক পূর্ণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমি স্বর্গের দেবতা নই, আনার! তুমি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছিলে,—আমি শাহজাদা। সূর্য্যকিরণে তোমার ভয় কেন আনার।"

আনার অধিকতর বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"তুমি স্বপ্ন—সেই সত্য হোক। আমার স্বর্গের দেবতা যেন কখনো এমন ভাবে ধরা দিতে না আসে। সূর্য্যকিরণের একটী অপূর্ব্ব বিচিত্র সুষমা পূর্ণ রেখা ক্ষুদ্র প্রজাপতির জীবন্ত আনন্দদায়ক হইলেও প্রচণ্ড সূর্য্যের নিবিড় আলিঙ্গন তাহার মৃত্যুর কারণ।"

শাহজাদা বিস্ময়ান্বিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"কে তোমার স্বর্গের দেবতা আনার! কাহার জন্য তোমার এ প্রেম রাত্রি জাগরণ?"

আনার আকুল কণ্ঠে উত্তর করিল,—"স্বর্গের দেবতা?—কেমনে বলি শাহজাদা, যদি সে আজ আমার শিয়রে আসিয়া না দাঁড়াইত! এই মর্ম্মের গোপন হর্ম্ম্যে যেখানে তিনি বিরাজিত, সেখানে তাঁহার সম্মুখে মন খুলিয়া হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে পারিতাম,—কে সে স্বর্গের দেবতা। বলিতে ভয় হয়, বাঁদীর ধৃষ্টতা শাহজাদা ক্ষমা করিলে বলিতে হয়,—আমার স্বর্গের দেবতা আজ আমার সম্মুখে!"

শাহজাদা প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আনার, এ তোমার স্বপ্ন নয় তো?"

আনার যুক্ত করে অশ্রু-আনত নেত্রে থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"শাহজাদা, যদি এ সত্য স্বপ্নও হইত, তবু আমি সুখী। ইহার বেশী কোনো বাঁদী আশা করিতে পারে না। জাগ্রতে স্বপ্নে আমার একই দেবতা। হে বেহস্তের মাণিক! স্বপ্ন এবং সত্য উভয়ই আমার নিকট সমান। জাগ্রতে আমার দেবতা দূরের হইলেও স্বপ্নে তিনি আমার একান্ত আপনার।"

শাহজাদা সস্নেহে আনারের হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রেম-প্লুত কণ্ঠে বলিলেন,—"আনার, তোমার মতো নির্ম্মল প্রেমের রাজ্য দীন-দুনিয়ার একমাত্র অধীশ্বরেরও প্রার্থনীয়; তুমি সত্যই আমার!"

আনার অধোমুখে চাহিয়া রহিল। শাহজাদা আনারের গণ্ডে একটী রক্তিম চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

পরদিন ইরাণী-বাঁদী আনারকলি শাহজাদার একমাত্র প্রিয়তমা পত্নী নাদিরা বেগম নামে পরিচিতা হইলেন।

* * *

আজ দিলদার আনিয়া শাহজাদাকে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—"যদি এতকালের ভালবাসা ভুলিয়া গিয়া না থাক তবে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে "হেরামের" বাহিরের উদ্যানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।—প্রেমানুগত ওমর।

পত্র পাঠ করিয়া শাহজাদা উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রাত্রিতে অন্তঃপুরের বাহিরের উদ্যানের এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন।

দ্বিপ্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। গাছের ছায়া বাগানের বুকে শুইয়া পড়িল। কতক্ষণ পর শাহজাদা দেখিলেন—আপাদ মস্তক

বোরকায় আবৃত করিয়া অন্তঃপুরের প্রান্তবর্ত্তী দরজা অতিক্রম করিয়া কে একজন বাগানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইল। তখন কে একজন কুঞ্জবনের প্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া সেই বোরকা-বেষ্টিতা মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বোরকার মুখাবরণ কতক অপসারিত হইল। যেন মেঘের অন্তরাল হইতে আধখানি চাঁদ ফুটিয়া বাহির হইল!

কতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আগন্তুক লোকটী মহিলার করতল স্বীয় করতলে আবদ্ধ করিয়া তাহাতে একটী আবেগ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

মহিলাটী দ্রুত অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল।

শাহজাদার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত-স্রোত খেলা করিতেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি মহিলার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পথরোধ করিয়া বলিলেন,—"কে তুই পাপিয়সী, নিশীথ রাত্রির নির্জ্জন অভিসারে!"

সেই কণ্ঠস্বরে মহিলা কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্কুচিতা হইয়া পথের এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

"কথা বল, নচেৎ এখনই তোমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিব"—শাহজাদা গর্জ্জিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

মহিলা বোরকা ঈষৎ উন্মোচন করিয়া বিষাদ মিশ্রিত করুণ কণ্ঠে বলিল,—"শাহজাদা, আমি নাদিরা।"

শাহজাদা বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলিলেন,—"সত্যই তুমি পাপিয়সী, নাদিরা! নিশীথ নির্জ্জনে কোন প্রেমাস্পদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়াছিলে?"

নাদিরা করুণকম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"শাহজাদা, এ আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম। আমি নির্দ্দোষ।"

"এই নিশীথ নির্জ্জনে অন্তঃপুরের বাহিরে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিলে নির্দ্দোষ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে—শাহজাদা এমন বাতুল নহে। এই চক্ষু যাহার সাক্ষী, তাহার নিকট কোন ছলনা বাক্যের অবতারণা বৃথা।"—শাহজাদা গর্জ্জিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

আনারের ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তাহা অস্ফুট চীৎকারের মতো বাহির হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

শাহজাদা বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন,—"সয়তানী, চুপ কর। স্বীয় অবস্থার কথা ভেবে দেখ। অসহ্য—উঃ! প্রায়শ্চিত্ত এখনই হোক।"

শাহজাদা কটি হইতে ছুরিকা উন্মোচন করিলেন।

উদ্যত মুষ্টির মধ্যে থাকিয়া শাণিত ছুরিখানা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল; শাহজাদা দুই পদ অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া আসিলেন; কঠোর কণ্ঠে বলিলেন,—"না, এ কলঙ্কিনীর শোণিতে এ হস্ত মলিন করতে চাইনে। এইখানেই তোর জীবন্ত সমাধি হোক—তা' হলে প্রকৃত দণ্ড হইবে।"

সেইখানেই নাদিরা বেগম শোকে দুঃখে স্বামীর অবিশ্বাস ও ঘৃণায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। কখন যে সে এ সংসারের শোক-দুঃখ অতিক্রম করিয়া শান্তি নিলয়ে আশ্রয় লইল, কেহ জানিল না। যুঁইফুলের শাখা হইতে শুভ্র আত্মার মতো ফুলগুলি নীরবে তাহার চতুর্দ্দিকে ঝরিয়া পড়িল, সুগন্ধটুকু মাত্র জগতের জন্য রাখিয়া গেল।

তারপর একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। সেদিনের মতো অমল জ্যোৎস্না-স্রোতে আজো সমস্ত উদ্যান পরিপ্লাবিত। নৈশ-আকাশের বিপুল নীরবতার মধ্যে কত হারাণ-স্মৃতির মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, কত লুপ্ত ঘটনার অশ্রুবাষ্প তাহার মুখে লুকাইত,—

তাহা পাঠ করিতে পারে কয়জন! কিন্তু অনেকেই তাহা কল্পনার নিগূঢ় স্বাদে আস্বাদন করিয়া লয়। অজানিত বেদনায় প্রেমমর্ম্মর নিঃশ্বাসে অনেকের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং শূন্য প্রাণের কোন বেদনাকে শতধারে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়।

শাহজাদার হৃদয় আজ শূন্য,—কেবল মাত্র শূন্য নহে—বিচূর্ণ! তিনি হেনাকুঞ্জের পার্শ্বস্থ বেদিকায় উপবেশন করিয়াছিলেন। হেনার সুরভি শ্বাস, তা'ও আজ তিক্ত; বুলবুলের প্রেমকাকলী অর্থশূন্য, এবং চাঁদের জ্যোৎস্না শীর্ণ মলিনতার বিশুষ্ক ছবি বলিয়া মনে হইতেছিল। শাহজাদা দেখিতেছিলেন, জগৎ সংসারের সমস্তই শূন্য ও বিরস। তিনি স্বীয় হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি জগৎ সংসারের সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। তাই তিনি ভাবিতেছিলেন, জগৎ সংসারের সবই শূন্য—সবই ফাঁকা ছায়াবাজী মাত্র। বন্ধুতা, ভালবাসা, প্রেম, সবই কি তাই? তবে মিথ্যার জগতের সমস্ত শূন্যতার মধ্যে প্রাণের অশান্তিটুকুও শূন্য হইয়া যায় না কেন? তবে কেন ভালবাসা, প্রেম, মানুষকে তিল তিল করিয়া পোড়ায়!

মানুষ ভুল করে, ক্রমে তাহা মানুষের স্বরূপ হইয়া পড়ে। শাহজাদার মন আজ উন্মত্ত। হায়! যাহাকে শাহজাদা প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, সেও কি তাঁহাকে ছলনা করিল।

এমন সময় শাহজাদা দেখিতে পাইলেন, নূতন কবরের কাছে কে একজন অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। শাহজাদা বিস্ময়ান্বিত ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন, নূতন কবরের উপর রাশিকৃত পুষ্পসম্ভার সজ্জিত করিয়া একটী যুবক একান্ত মনে কি প্রার্থনা করিতেছে। শাহজাদা সন্নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, যুবকের গণ্ড বাহিয়া অশ্রুবিন্দু কবরের মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে।

শাহজাদা কিছুকাল স্তব্ধের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে যুবক উর্দ্ধনয়নে প্রণিপাত করিয়া বলিল,—"খোদা! ভগ্নীকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিও। এই নিষ্ঠুর ভ্রাতার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয়—বলিয়া দেও প্রভু?"

শাহজাদা অগ্রবর্ত্তী হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"কে তুমি —কাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছ?"

যুবক মস্তক তুলিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল,—"দেবীর পূজা করিতেছি। তিনি এখন স্বর্গলোকে। শাহজাদা, এ হতভাগাই সেই দেবী প্রতিমাকে হত্যা করিয়াছে!"

শাহজাদা সংশয় পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি?—তাহাকে হত্যা করিয়াছ—কেমনে?"

"শাহজাদা, আমিই না জানিয়া সহোদরা ভগ্নীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। বোনটীকে ছোট রাখিয়া পিতামাতা উভয়েই যখন স্বর্গে গেলেন, এই বাহু কত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বোনটীকে রক্ষা করিয়াছিল। আমি ছাড়া তাহার অন্য আশ্রয় কিছুই ছিল না। তারপর দুইজনে কত কঠোর শ্রম করিয়া এই স্বর্ণভূমি হিন্দুস্থানের মাটিতে আসিয়া পদার্পণ করিলাম। আমি বাদশাহের সৈনিক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করি। আনার এই বাদশাহের অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইয়াছিল। আমি ভগ্নীঘাতক পাপিষ্ঠ ওমর!"

ওমরের অবিরাম অশ্রুধারা কবরের মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছিল।

"ওমর! আমিই তোমার প্রেমময়ী ভগ্নীর মৃত্যুর কারণ। হায়, খোদা! কি কঠোর শাস্তি দিলে আমাকে—"শাহজাদার কণ্ঠ শোকাবেগে নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অবনত হইয়া কবরের মৃত্তিকা চুম্বন করিতে লাগিলেন।

৫—

কোন্ অভূতপূর্ব্ব বেদনার রসে আপ্লুত হইয়া কোকিলের কণ্ঠে হেনার গন্ধে শূন্য আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল! চাঁদের জ্যোৎস্না কোন্ বেদনা মাখা করুণ মুখখানির ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল!

কতক্ষণ পরে শাহজাদা ওমরের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই ওমর, তুমি এখানে আমিরের পদ গ্রহণ করিয়া অবস্থান কর।"

ওমর কাতরকণ্ঠে বলিল,—"শাহজাদা, আর আমার ধন গৌরবের বিন্দুমাত্র অভিলাষ নাই। এখন কোথাও নির্জ্জনে ঈশ্বর ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিব। শুধু প্রার্থনা, বৎসরান্তে এই দিনে আসিয়া যেন এই প্রেমময়ীর কবর দর্শন করিতে পারি,—এই অনুমতি করুন।"

* * *

তারপর কত বিজন-সন্ধ্যা, কত নীরব-রাত্রি শাহজাদাকে শোকতপ্ত অশ্রুপাতে এই কবরের মৃত্তিকা সিক্ত করিতে দেখিয়াছে, ইয়ত্তা নাই।

কিছুদিন পরে শাহজাদা এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড "মকবরা" নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে একখানি তুষারধবল মর্ম্মর পাথরে প্রাণের কয়েকটী কথা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিলেন।

"আগর্ মন্ বাজ বাইনাম্ রিউ ইয়ার-ই-খেশ্ রা।
তা কেয়ামৎ শুকর্ গোয়াম্ কির্ দিগার-খেশ্ রা॥

১১ই ফাল্গুন, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ
লাহোর
আনারকলি।

দান-প্রতিদান

দিগন্ত প্রসারী মরুভূমির মধ্য দিয়া নীলনদের সুস্বাদু সুশীতল বারিধারা প্রবাহিত হইয়া কুঞ্জ-বন-বীথি পূর্ণ একটী হরিৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। দুইদিকের বালুবিস্তীর্ণ নিরাশা পূর্ণ দিগন্ত ব্যাপী প্রান্তরের মধ্যস্থলে এমন সজল শ্যামল দেশ বিধাতার অচিন্ত্য করুণার পরিচায়ক ;—নীলনদ দুই কূল ভাসাইয়া অমৃত ধারায় এই শোভাটুকু সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। দিগন্তের যত পাখী--এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লয়, আঙ্গুর, বেদানা ও আনারে বনকুঞ্জ ভরিয়া উঠে ; খর্জ্জুর-কুঞ্জে তোতা সুমিষ্ট গান গায়, দয়েল শীষ্ দেয়, আর গোলাপ কুঞ্জে বুলবুল 'মস্গুল' থাকে, শ্যামল ক্ষেত্রে সোনার শস্য পাকিয়া উঠিলে পাগল-পারা হাওয়া দোল দেয়, রবি স্বর্ণআভা বিছায় ; চাঁদ নীলনদের জলে ও বনকুঞ্জের মাথায় হেলিয়া পড়ে।

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। সম্মুখে নীলনদ। অপরাহ্ণ। বনকুঞ্জের মধ্যদিয়া রবির স্বর্ণআভা গলিত স্বর্ণরেখার মতো আসিতেছিল। দয়েল বহুক্ষণ শীষ্ দিল, শেষে ক্লান্ত হইয়া উড়িয়া গিয়া পকশ্রী খর্জ্জুরের বক্ষে চঞ্চু বিদ্ধ করিল ; অতি পক্ক ফলগুলি চঞ্চুর তীক্ষ্ণ স্পর্শেই মাটিতে ঝরিয়া পড়িল। দুইটী বালক বালিকা আসিয়া তাহা কুড়াইতে লাগিল। পাখী নিরাশ হইল না ; ক্রমাগত চঞ্চু বিদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক ফল ঝরিল, কিন্তু একটীতেও তাহার তৃপ্তি হইল না। শেষে দয়েল অন্য বৃক্ষে উড়িয়া গেল ; ক্লান্ত শুষ্ক কণ্ঠে সেই বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ফল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল।

গাছের তলে যে দুইজন ফল কুড়াইতেছিল, তাহাদের নাম,—সোরাব ও মিশরী। উভয়েই কিশোর বয়স্ক। মিশরী সোরাবের পিতার লালিত কন্যা; উভয়েই বাল্য সঙ্গী ও সৌহৃদ্য পরায়ণ। সোরাবের পিতার একান্ত ইচ্ছা,—এই দুইজনকে একত্র বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত করেন। দুই জনই সে কথা অবগত ছিল, কিন্তু তাহাদের সৌহৃদ্য সে জন্য গাঢ় হয় না। তবে কেন?—সে কথা তাহারাও বলিতে পারিত না। দুইজনই পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করিত; বোধ হয় তাহা আত্মার টান—হৃদয়ের সঙ্গেও তাহার সংস্পর্শ ছিল না। শৈশবের নিরবচ্ছিন্ন প্রীতির সঙ্গে প্রাণের প্রবাহ বাড়িয়া উঠিলে তাহাকে প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবা অসম্ভব হইয়া উঠে। দুই জনের তাহাই হইয়াছিল।

সোরাব বড় হইয়াছে। সোরাব যে যুদ্ধে যাইবে, সে কথা শুনিয়া মিশরী দুঃখিত হইল না; কিন্তু তাহার জীবনটার সার্থকতার সঙ্গে সোরাবের জীবনের কতখানি ছাড়াছাড়ি, তাহাই সে ভাবিতেছিল। মানব একটা অনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ সঙ্গীকে যদি অদৃশ্য দেখে, তবে যেমন তাহার মনে একটা ভাবের আবেগ উপস্থিত হয়, মিশরীর তাহাই হইয়াছিল। মিশরীর আন্তরিক দুঃখ আর কিছুই নহে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে সোরাবের সঙ্গিনী হইতে পারিবে না, এই দুঃখ। এই স্থানেই জীবনের একটা বিশাল ব্যর্থতা আসিয়া তাহার জীবন-পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈশব হইতে দু'জন এক কার্য্যে ব্রতী ছিল, আজ সহসা একজন যদি স্বীয় কর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, অথবা কোন গৌরব আসিয়া যদি এক জনকে বরণ করে, তবে মনে মনে যেমন একটা আঘাত সঞ্চিত হয়,—

তাহা ব্যর্থতারও নহে, লেশ মাত্র ঈর্ষারও নহে, তবু তাহা হৃদয়কে ব্যথিত করে। মিশরীর তাহাই হইয়াছিল। কে বলিবে এই কর্ম্ম বিভাগের সঙ্গে ভেদের কালো দাগ অঙ্কিত হইয়া বেদনা আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিবে না! জীবনের গতি কয়জন নিশ্চিত অবধারিত পথে পরিচালিত করিতে পারে? স্রোতের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ঘূর্ণাবর্ত্তের কুটিলতাও সৃষ্ট হয়। কাজেই মিশরীর মনে অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সোরাবের সঙ্গে তাহার যে যোগ, স্ত্রী ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইলেও সে যোগ সে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়না। কিন্তু কোন মতেই মিশরী সোরাবের যুদ্ধ-যাত্রার সঙ্গিনী হইতে পারিল না।

সোরাব পিতার সঙ্গে যুদ্ধে গেল। যুদ্ধে যাইবার সময় সোরাব বলিয়া গেল,—"মিশরী, আমাদের ভালবাসা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হইব না।"

তাতার দস্যুরা মিশর দেশ আক্রমণ করিয়াছে। অধীনতা অথবা মৃত্যু এই লইয়া যুদ্ধ চলিতেছে। মরুভূমিতে, পর্ব্বতে, কান্তারে শ্মশানক্ষেত্র রচিত হইতেছে।

সোরাবের পিতা যুদ্ধে অন্তিম-শয্যার বিশ্রাম লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ করিতে পুত্রকে রাখিয়া গেলেন। সোরাব অল্প সংখ্যক মিশর সৈন্যের সাহায্যে বিশাল তাতার দস্যুদলের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল।

ক্রমে দেশ তাতারদের করায়ত্ত হইল। স্বদেশ রক্ষার্থ যাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহারা বিপ্লব বাদী রূপে গণ্য হইয়া গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে লাগিল। পরাজিত দেশবাসীরা যুদ্ধ ত্যাগ করিল। সোরাব তাহা পারিল না, সে লোকালয়ের মমতা

পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অরণ্যে স্বাধীন সিংহের মতো বিচরণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল।

কিছুদিন পরে সোরাব বন্দী হইয়া তাতার সেনাপতির সম্মুখে নীত হইল। কারাদণ্ড অপেক্ষা মৃত্যু সোরাবের নিকট অধিক গৌরবজনক বোধ হইল। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সোরাবের বিচার ফল নির্দ্ধারিত হইল।

* * *

ঘনান্ধকার রাত্রি—বর্ষণ-ক্লান্ত, স্তব্ধ। মেঘমালা আকাশের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে মেঘে মেঘে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছিল। সোরাব কারাগারের গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আকাশের অবস্থা দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল—নিজের অদৃষ্টের কথা।

মৃত্যুর জন্য সোরাব ভীত নহে; কিন্তু সে পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিল না, সেজন্য দুঃখিত। আর মিশরী তা'র হৃদয়ের অধিশ্বরী, না জানি সে কেমন আছে! সোরাব প্রকৃতির অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিতেছিল। আজ প্রকৃতির এই ভীষণ অবস্থা, কিন্তু কাল হয়তো মেঘমুক্ত গগনে দিবালোকের উজ্জল আভা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সোরাবের মনে হইল, সে যদি আজ কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারিত—হয়তো মিশরের সুখ-সূর্য্য আবার উদিত হইত। হায়! মৃত্যু-সময়েও লোক আশার বশীভূত হয়। মৃত্যু তো সোরাবের কণ্ঠলগ্নই রহিয়াছে।

দুঃখের রজনী দীর্ঘ; উৎকণ্ঠাপূর্ণ সোরাবের রাত্রি আর প্রভাত হইতেছে না। এমন সময় কে আসিয়া কারাগারের দ্বার মুক্ত করিল। সোরাব মনে করিল, বুঝি ঘাতক আসিল, কিন্তু বিদ্যুৎ-

স্ফুরণের ক্ষণস্থায়ী আলোকে দেখিল, না, একজন স্ত্রীলোক—নিষ্ঠুর হৃদয়া তাতারিণী নয় তো?

রমণী তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ধীরস্বরে বলিল,—"সোরাব, তুমি মুক্ত হইলে কি কর?"

সোরাব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল,—পুনরায় তাতার দস্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করি।"

রমণী ধীরস্বরে বলিল,—"আমার সঙ্গে আইস। যদি মুক্তি চাও, বিলম্ব করিও না।"

রমণী সোরাবের হস্ত পদের শৃঙ্খল মুক্ত করিল। সোরাব কারাগারের বাহিরে আসিয়া বলিল,—"রমণী, তুমি কে জানি না, যদি সফলকাম হই, পুনরায় দেখা হইবে। এই লও আমার হস্তের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী। যদি কখনো আমার সুদিন আসে, আমার নিকট লইয়া যাইও। সোরাব কৃতজ্ঞ কি না জানিতে পারিবে।"

সোরাবের মনে হইল, রমণী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সোরাব সেই স্থান হইতে একটী অশ্ব লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

* * *

ত্রিশ বৎসর মিশরবাসীরা তাতারবাসীর অত্যাচার সহ্য করিয়া আবার স্বাধীনতার জন্য জাগ্রত হইল, অত্যাচারের আধিক্যে মৃত্যুর বিভীষিকা লোকের মন হইতে দূর হইতে লাগিল।

আবার যুদ্ধ বাঁধিল। সৈন্যাধ্যক্ষ সোরাবের সঙ্গে তাতার-সেনাপতি ইস্‌মাইল খাঁর সমর বাঁধিল।

মরু প্রান্তরের দুইদিকে মুখামুখী হইয়া তাতার সৈন্য ও সোরাবের সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে, ইহাই বোধ হয় সংগ্রামের শেষ অভিনয়।

কয়েকদিন ভীষণ যুদ্ধের পর বহু তাতার সৈন্য নিহত হইল। অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

ইস্‌মাইল খাঁকে বন্দী করা সোরাবের একান্ত ইচ্ছা ছিল; কারণ ইস্‌মাইল মিশর সীমা অতিক্রম করিতে পারিলে পুনরায় সৈন্যদল লইয়া মিশরের ধ্বংশ চেষ্টা করিতে পারে। এইজন্য শত্রুকে ধৃত করাই সোরাবের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

ইস্‌মাইল স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু এখনও মিশরসীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই।

সোরাব সারাদিন অশ্ব ছুটাইয়া নীলনদের কূলে খর্জ্জুর কুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিল, এমন সময় একজন লোক একজন মহিলা ও দুইটী শিশুসন্তান লইয়া নদ অতিক্রমণের জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। উহাদের পরিচ্ছদাদি দেখিয়া সোরাবের স্বতঃই সন্দেহ জন্মিল,—উহারা বিদেশী। মহিলার আপাদ মস্তক বোরকায় আবৃত।

সোরাব তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিল,—"কে তোমরা? কোথায় যাইতেছ?

পৌরুষ কণ্ঠে উত্তর হইল,—"তোমার প্রয়োজন?"

সোরাব বলিল,—"কাপুরুষ! কলঙ্ক লইয়া পলাইতেছ!"

পুরুষ উত্তর করিল—"আইস, সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বের পরীক্ষা হউক।"

সোরাব এবং সেই পুরুষ অসি নিষ্কোষিত করিয়া পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। উভয়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ হইল। অবশেষে উক্ত পুরুষ সোরাবের অসিতে ছিন্নশির হইয়া ভূপাতিত হইল।

মহিলাটী ধীরে অগ্রসর হইল। অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ হইতে সুমিষ্ট

করুণ স্বর বাহির হইল,—"বীর পুরুষ, এই অনাথ শিশুপুত্র দুইটীরও তুমি সদ্গতি কর।"

সোরাব উত্তর করিল,—"ক্ষমা করিলাম। যাও, ইহাদের লইয়া তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।"

রমণী উত্তর করিল,—"আমার দেশ! সে কোথা? এই তো আমার দেশ।"

রমণী অবগুণ্ঠন অর্দ্ধেক উন্মোচন করিল। তাহার আরক্ত চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সোরাব সবিস্ময়ে দেখিল, রমণী আর কেহই নহে,—মিশরী—তাহার বাল্যের সহচরী ও যৌবনের সমস্ত সুখ-স্মৃতির অধীশ্বরী!

ঊর্দ্ধফণ সর্প দেখিলে লোক যেমন শিহরিয়া পিছাইয়া আইসে, সোরাবও তেমনই করিল। তাহার পর সে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কি পিশাচী! কলঙ্কিনী! আমার চিরদিনের সুখ-স্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিলি?"

রমণী এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"সোরাব, যদি অন্যায় কিছু করিয়া থাকি, ক্ষমা কর। আমার কথা শোন।"

সোরাব সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল,—"অন্যায়! আমার জীবনের সব আশা, সব গৌরব, সব স্পর্দ্ধা অতল তলে ডুবাইয়াছ! অন্যায়! যদি প্রতিশোধ চাহ, আজই দিব।"

রমণী সগর্ব্বে উত্তর করিল,—"সোরাব, ভেদ তুমিই আনিয়াছিলে। যদি শৈশবের কথা মনে পড়ে, ভ্রাতার মতো ব্যবহার করিও। জানিও আমিও পতিপ্রাণা। মৃত পতির শব আমার সম্মুখে। আমার কি প্রতিশোধ দিবার নাই? তবে আমি রমণী, ভ্রাতার দোষ মার্জ্জন করিতে পারি, আবার স্বামীর সহস্র অন্যায় বহন করিতেও পারি।"

সোরাব ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হইয়া রহিল, তাহার পর আত্মসম্বরণ করিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—"মিশরী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর; আইস আবার আমরা শৈশবের স্নেহ-স্মৃতি-কুঞ্জে ফিরিয়া যাই।—তোমাকে না পাইলে আমার জীবন ব্যর্থ হইবে। আইস, সংসারের কঠোর নিষ্পেষণ অগ্রাহ্য করিয়া আবার নূতন করিয়া জীবন-যাত্রা আরম্ভ করি—আবার দুইজন এক হই।"

মিশরী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল,—"সোরাব, কর্ত্তব্য তুমি যেমন জান, আমিও তেমনই জানি। আমার পতিভক্তি এত শিথিল নহে যে, প্রলোভনে বা অতীত স্নেহ-মোহে আমি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইব। অতীত! যাহা ধ্বংস হইয়াছে, সোরাব, তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিও না। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতা আমার কি তোমার নাই। যদি আমাকে ভালবাস, তবে ভ্রাতার মত স্নেহ দিও, ইহার অধিক ইচ্ছা বা আশা করিও না।

সোরাব এবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মিশরীর মুখের দিকে চাহিল, বলিল—"মিশরী, আজ এ কি বলিতেছ? ঘটনা অকরুণ হইয়াছিল বলিয়া আজ তুমিও অকরুণ হইলে! ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধনায় অরণ্যে পর্ব্বতে কাটাইয়াছি, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আজ এই কি প্রতিদান, মিশরী? কর্ত্তব্য আমিও বিস্মৃত হই নাই; কিন্তু, তাই বলিয়া কি সব বিস্মৃত হইব, মিশরী?"

মিশরী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল,—"তোমার কর্ত্তব্য তুমি সম্পন্ন কর—আমার কর্ত্তব্য পালনে তুমি বাধা দিও না।"

সোরাবও দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"মিশরী, তবে আমি তাহাই করিব।

তোমার সঙ্গী এই বালকদ্বয় আমার বন্দী। আমি ইহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিলাম—ধর্ম্মাধিকরণে সমর্পণ করিব। কারণ, ইহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে দেশে অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে। তুমি যথা ইচ্ছা যাইতে পার।"

মিশরী পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সোরাব বালক দুইটীকে লইয়া চলিয়া গেল। মাতৃসঙ্গছিন্ন বালক দুইটীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি বহু দূর হইতে মিশরীর কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ পরে সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া দৌড়াইল; কিছুক্ষণ মধ্যে সোরাবের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল,—"সোরাব, তুমি যাহা চাহ দিতে প্রস্তুত আছি; বালক দুইটীকে ছাড়িয়া দেও।"

সোরাব বলিল,—"জীবনের তৃপ্তি—তোমার ভালবাসা;—তুমি আমাকে বিবাহ করিবে এই প্রতিশ্রুতি চাই।"

"অসম্ভব।"

মিশরী ফিরিয়া আসিল।

* * *

ঘন অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত; বায়ুর শন্ শন্ শব্দ ক্রন্দনের মতো চতুর্দ্দিকে বাজিতেছিল।

সোরাব বালক দুইটীকে লইয়া পুনরায় নীল নদের দিকে আসিতেছিল। স্তব্ধ অন্ধকারে সুদূর আকাশের তারা একমাত্র আলোকবর্ত্তিকা।

সোরাব ডাকিল,—"মিশরী, মিশরী!"

কোনো সাড়াশব্দ নাই। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ!

সোরাব আবার ডাকিল,—"ভগিনী, মিশরী! ভগিনী! এস, আমি আর কিছুই চাই না; কেবলমাত্র তোমার স্নেহের ভিখারী।

কোন উত্তর আসিল না। চতুর্দ্দিক খুঁজিয়া সোরাব যথায় আসিল, তথায় তাহারই তরবারি ছিন্ন শব ভূপতিত। একটী অন্তিম করুণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—"মিশরী সাধ্বী! সোরাব, জানিও—মিশরী ভ্রাতৃস্নেহপরবশ। সে যাহা রচনা করে—নিষ্কাম কামনার।"

সোরাব করুণকণ্ঠে বলিল,—"কোথায় ভগিনী! আমি আসিয়াছি।"

মিশরীর জড়িত কণ্ঠ হইতে কথা বাহির হইল,—"প্রেম নিষ্কাম পুণ্য।"

সোরাব করুণ কণ্ঠে বলিল,—"ধূলিশয়নে কেন তুমি, মিশরী! উঠ।"

মরণাহত রমণীর মুখ আর খুলিল না। কণ্ঠে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া মিশরী স্বামীর সহযাত্রী হইয়াছে। মিশরীর একটী অঙ্গুলী হইতে হীরকের জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল; সে অঙ্গুরীয়কে লিখিত ছিল,—"সোরাব"।

ঘনান্ধকার রাত্রিতে কারাগারে—মৃত্যুর প্রলয়ঙ্করী বিভীষিকা সোরাবের মনে পড়িল। তবে মিশরী তাহাকে রক্ষা করিতেই ইস্‌মাইল খাঁকে আত্মদান করিয়াছিল; আর সতীত্ব রক্ষা করিতে আজ প্রাণ দান করিল!

১০ই চৈত্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

লাহোর।

মিলন

মির্জ্জাপুরের কজলী গান বড় প্রসিদ্ধ,—বড় সুশ্রাব্য। প্রীতির ঘন বর্ণ গায় মাখিয়া প্রেমিক আকাশ যখন আপনার কমণ্ডলুর সহস্র বারিধারায় গ্রীষ্মের অসহ্য আতপ তাপ বিদূরিত করিয়া একটা সুস্নিগ্ধ শীতলতা সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে কজলীর সুমধুর রাগিণী স্ফুরিত হইয়া উঠে। বৃক্ষ পত্রে পত্রে, শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত মাঠে কচি-পুলক মাখা জাগিয়ে তোলে; মহুয়া ফুলের গন্ধে মাতাল পবন দিগ্বিদিকে ছুটোছুটি করিয়া বেড়ায়!

রঙিণ ওড়নার নীচে কুলবধূগণের কাজল-পরা চোখের তরল চাহনি, হাস্য-রঞ্জিত মুখে কজলীর সুমধুর রাগিণী, মেহেদী-রাঙা নূপুর-বেড়া পায়ের রিনিঝিনি রাগিণী বর্ষা-সুখসুপ্তিকে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে জাগ্রত ও চঞ্চল করিয়া তোলে!

দলে দলে স্নানের ঘাটে লোক চলিয়াছে,—স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ভিড়;—সকলের মুখে কজলী গানের ছড়া, পদ খুব সংক্ষিপ্ত; যেন আনন্দের ক্ষুদ্র একটী চঞ্চল লহরী!

গঙ্গার স্বচ্ছ বারি আজ বর্ষার স্রোতজলে রঙিণ হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বাড়ী খানি একেবারে গঙ্গার কিনারে। মফস্বল থেকে ফিরে বরাবর স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, স্ত্রী একটী ক্ষুদ্র শিশুকে সম্মুখের চেয়ারের উপর বসাইয়া তার অর্দ্ধস্ফুট বাণীর অর্থ পরিগ্রহে ব্যস্ত আছেন।

এমন একটী অপরিচিত শিশুর আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"একি! স্ত্রী তাহার চিরন্তন গাম্ভীর্য্য হইতে ক্ষণমাত্র

বিচলিত না হইয়া বলিল,—"কেন, তোমাকে যে বলেছিলাম,—এ আমার ছেলে।"

ইহাতে ছেলের পিতৃদেবের বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্বেও আমার মনে হইল, মফস্বলে যাইবার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী একটী অনাথা রমণীর শিশু সন্তান বিক্রয়ের কথা এবং উহা তাহার গ্রহণের অভিপ্রায় জানিয়েছিল। আমি ঘাড় নেড়ে এ প্রস্তাবে কতকটা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু স্ত্রী দেবী মোটেই ইহা কোন ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন নাই। কারণ, ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর বিষয়ে কোন সময় বাধা প্রদান করিয়াও দেখিয়াছি, ফল উভয়তঃ সমান।

আমার স্ত্রীটী কিছু খেয়ালী—স্ত্রীর নিজের আত্মীয়গণের এই মত, কিন্তু বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ পাড়া প্রতিবেশীর নিকট তিনি স্বয়ং মা ভগবতী ব'লে প্রখ্যাতা,—কারণ, খোসামুদে জিনিষটা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং যে কেহ এ কার্য্যে চতুর ছিল, তাহার চতুর্ব্বর্গের এক বর্গ ফল তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে ঠেকিয়া যাইত।

আমার নিকট তিনি যে কি ছিলেন, তাহা বিবাহের ইতিহাসটা খুলিয়া বলিলেই স্পষ্ট হইবে। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের যখন বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীটী এক প্রকার বালিকা বলিলেই চলে। কিন্তু অনেক কচি জিনিষেই তাহার স্বাভাবিক গুণটা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়,—তেতুলের টক ও শূয়রের গোঁ জিনিষটা ঠিক তদনুরূপ। অতি অল্প বয়সেই বালিকাকে বাগ মানাইতে সমর্থ হই নাই—এক পক্ষে গর্ব্বের কথা বটে! যৌবনে দৃঢ়তার হ্রাস প্রাপ্তির কথা কোন বিজ্ঞান লিখে!

বিবাহ হইয়াছিল— বর ও কন্যা পক্ষের টাকার ওজন লইয়া, মনুষ্য-

হৃদয়ের ইতর সম্পর্ক তাহাতে আদৌ ছিল না,—প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান! কিন্তু পরেও সে সম্পর্ক স্থাপন বিশেষ আবশ্যক মধ্যে গণ্য হয় নাই।

স্ত্রীটী বড়লোকের কন্যা—হৃদয় অপেক্ষা টাকার আত্মীয়গণ তাহার নিকট অধিক আদরণীয় ছিল। তজ্জন্য তৎসমুদয় আত্মীয়গণের সংখ্যায় গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

বিবাহের পর দু'জনার মধ্যে ভাব হইল, যেন ঠিক রাহু কেতুর প্রণয়। কিছুকাল পরে দুইজনে—পোর্ট আর্থার যুদ্ধে শ্রান্ত মহারথীর মতো উভয়পক্ষের সুবিধার জন্য—সন্ধি হইল। তারপর হইতেই চাকরী নিয়ে দু'জনে বিদেশে বাস করিতেছি।

আমাদের আট বৎসর এই প্রকার নিগূঢ় দাম্পত্য প্রণয় যাপনের পরেও একটী শিশু সন্তান আমাদের হৃদয়রাজ্য অধিকারের জন্য আসিল না। কাজেই দু'জনেই পরস্পরের সুখ, সুবিধা নিয়ে দিন কাটাইতে লাগিলাম।

আমি বলিলাল,—"তা' তো বুঝলুম,—তোমার ছেলে!"

স্ত্রীঠাকুরাণীর "আমার" শব্দটার প্রতি ভারি আন্তরিক অনুরাগ ছিল; বাড়ীর কোন্ জিনিষটা ত'ার এবং কোন জিনিষটা আমার, এসম্বন্ধে তার একটা ভারী প্রত্যক্ষ পরিমাপ করা ছিল। "তোমার কোঠা", "তোমার টেবিল", "তোমার চাকর", "আমার দাসী", "আমার রান্নাঘর", "আমার বিছানা" ইত্যাদি। বিশ্বের সমস্ত জিনিষের মধ্যে কোন্ জিনিষটা তার নিজের, তৎসম্বন্ধে তার খুব অবিকৃত ধারণা ছিল। যেন ত্রিকোণমিতির সূক্ষ্ম গণনা! বিশ্বের অনাবিষ্কৃত জিনিষের মধ্যে আমার স্ত্রীর মনটী প্রধান। আমি নাবিক কলম্বস সুদীর্ঘ আট বৎসরেও তাহার কোন সন্ধান পাই নাই

আমি স্ত্রীর ভাবগতিকের ওজন বুঝিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা বেশ! এখন তোমার সময় কাটাবার সুবিধা হলো।"

পরে যখন জানিতে পারিলাম, স্ত্রী তার গয়নাপত্র দাসীদ্বারা বাজারে বিক্রি করিয়া এই শিশুর অনাথা মাতাকে অর্থ দিয়াছে, তখন আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"কেন, আমাকে বল্লেই তো হতো, অতো করবার কি দরকার ছিল? টাকার কি এতই অভাব ছিল!"

স্ত্রী বলিল,— "আমি মনে করেছিলুম, তুমি আপত্তি করবে, তাই তোমায় বলিনি, একেবারে কিনে নিয়েছি, এ এখন আমারই হলো।"

কথাটা সঙ্গত বটে!

"সকল কাজেই তোমার এই রকম ব্যবহার"—আরো কিছু তীব্র বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় শিশুটী খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কাজেই এইখানেই কথাটার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল।

দু'দিন স্ত্রীর সঙ্গে বেশী বাক্যালাপ করি নাই। অপর কক্ষে স্ত্রী সেই শিশুটীকে নিয়ে আমোদ ও খেলায় মত্ত থাকিত। ক্ষুদ্র শিশুর উচ্চ হাস্যধ্বনি আমার হৃদয় মধ্যে কেমন একটা অভূতপূর্ব্ব সুকোমল ভাবের সৃষ্টি করিতেছিল—যেন একটা ক্ষুধাতুর আত্মা হৃদয় মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল। তৃতীয় দিনে আমার স্ত্রী শিশুটীকে বিছানায় শুইয়ে রেখে অন্য বাড়ীতে বেড়াতে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে একটী অতি দরিদ্র ও রোগশীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার রমণী আমাদের গৃহের দরজায় এসে দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি চাও?" সে বলিল, সে তার ছেলেটীকে একবার দেখিয়া যাইতে চায়।

আমি বলিলাম—"এখন আবার এইটুকু বাকি রেখেছে!" রমণীর চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে বলিল, তার

আর একটী ছেলে আছে, সে অন্ধ। তার আর বেশীদিন বাঁচিবার আশা নাই, কাজেই অন্ধ ছেলেটীর ভাবনায় কাতর হয়ে ভাল ছেলেটীকে আমাদের হাতে দিয়ে অন্ধ ছেলেটীর জন্য কিছু অর্থ রেখে যেতে চায়।

শুনে আমার মনের রাগ বিদূরিত হ'য়ে ভয়ানক কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কি স্বার্থপর—ধনীর স্নেহ মমতা!

রমণীকে আমি ডেকে শিশুটীর কক্ষে নিয়ে গেলাম। ধব্‌ধবে বিছানার উপর তার পূর্ব্বের কালিধূলিমাখা শিশুটীকে পরিষ্কৃত জামা কাপড়ে সজ্জিত হয়ে নিদ্রিত দেখে রমণীর চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করে অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি ব্রাক্স খুলে কিছু অর্থ নিয়ে রমণীর হাতে দিলাম। রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রী বাড়ী ফিরিয়া আসিলে আমি বলিলাম,—"এ ছেলে কেবল তোমার নহে,—আমারও কিছু 'শেয়ার' আছে। আজ সেই অনাথা রমণী এসেছিল, আমি তা'কে তোমার সমান অর্থ দিয়াছি। এখন বুঝ্‌তে পারলেম, ইহা আমাদের দু'জনেরই।" স্ত্রী একটু ভেবে বলিল,—"আচ্ছা, সে একই কথা।"

তখন হইতে আমার স্ত্রী এই ছেলেটীর উন্নতি ও সেবা-শুশ্রূষা বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতে লাগলো।

স্ত্রী বলিল,—"তবে আমাদের ছেলের একজন ধাত্রীর আবশ্যক। আমি একজন ঠিক করেছি, তুমি কি বল?"

আমি উৎসাহ দিয়ে বলিলাম,—"বেশ, ভালই করেছ।"

স্ত্রী। ওর জিনিষ পত্রও তো কিছু দরকার হবে।

আমি আগ্রহ সহকারে বলিলাম,—"বল, কি কি চাই, আমি আজই নিয়ে আসবো।"

স্ত্রী। তা, এখন কিছু দরকার হবে না, আমি প্রায় সবই আনিয়েছি।

স্ত্রী সকল বিষয়েই আমার এইরূপ সম্মতি চাহিত।

এই ছেলেটীর বিষয় নিয়ে আমরা প্রায় দুজনে একত্র বসে কথাবার্ত্তা বলিতাম। বাড়ীর সমস্ত কথাবার্ত্তাই যেন ইহাকে জুড়িয়া বসিয়াছিল। "চুপ কর, এখন সে ঘুমুচ্ছে।", "বস, আমি এখন ওর খাবার তৈরী করে আসি",—বাড়ীর যা কিছু কথাবার্ত্তা, সমস্তই যেন তাহাকে লইয়া চলিতেছিল।

আমি বলিলাম,—"শুধু ও ও করিলে চলিবে কেন? ওর একটা নাম রাখা তো চাই!"

স্ত্রী বলিল,—"তাই তো, আমি সেই অনাথা রমণীকে ওর নাম জিজ্ঞাসা করে রাখি নাই। ও ফের আস্‌বে বলেছিল। বোধ হয় ওর অসুখ বেড়ে থাক্‌বে। যা, হোক, ওর নাম থাক, নলিন—কেমন?"

আমি বলিলাম,—"সুরেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ইত্যাদি নামই তো আজকাল চল্‌তি—সুধীন্দ্র রাখনা কেন?"

স্ত্রী বলিল,—"না, ওর নাম যা' রাখা হয়ে গেছে, তা আর বদলানো যায় না।"

আমরা দু'জনে কথা বলিতে বলিতে যখন থামিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতাম, তখন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী সেই ক্ষুদ্র শিশুটী তা'র বিস্তৃত চক্ষু দুটী তুলে একবার আমার দিকে, একবার আমার স্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিত, যেন সেই উজ্জ্বল নির্ম্মল চক্ষু দু'টী তার নীরব ভর্ৎসনা দ্বারা বলিত—"একি! থাম্‌লে কেন?" —অনেক সময় আমরা এই ছোট বালকের সম্মুখে যেন লজ্জিত হইয়া পড়িতাম। নিজেদের বলিবার কিছু থাকিত না, কাজেই দু'জনকে

কেমন অপ্রস্তুত মনে হইত। বালকটী যদি বাক্য প্রকাশের অস্ফুট ধ্বনি করিত, তখন আমরা দু'জনে প্রাণ খুলিয়া হাসিতাম।

আমি যখন নিজের লেখায় ব্যস্ত থাকিতাম, তখন অপর কক্ষে স্ত্রীর সুস্পষ্ট হাস্যধ্বনি শুনে আমার প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইত।

সে দিন বসন্তের অপরাহ্ণ। আমাদের বাগানটী অজস্র রঙিণ ফুলে রঙিণ হয়ে উঠিয়াছে। তাহাতে সোনালী রৌদ্র-আভা কেমন ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। নানা বিচিত্র রঙের শাড়ী কোমরে আঁটা হাজারো প্রজাপতি সোনালী আলো-সমুদ্রে সাঁতার দিয়া কখনো ফুলের বুকে আপনার সরু শুঁড়টী ডুবিয়ে দিয়ে মধুপানে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করিতেছিল। তাহাদের ঝলক দেওয়া পাখার আভা কিরণ-সমুদ্রে নূতন আলোর ঢেউ তুলিতেছিল;—যেন হাজারো পরীর সোহাগ-ঢালা আমাদের এ বাগান খানি রঙের ছটায় আকুল হয়ে উঠিয়াছে!

আমি বাগানের দিকে জানালার ধারে বসে লিখিতেছিলাম, গল্প—হতাশ প্রণয়ের কাহিনী। এমন সময় বাহিরে শিশুকণ্ঠের হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিলাম। খল খল হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জানালাটী সম্পূর্ণ খুলে দেখি, স্ত্রী বালকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া মৃদুচরণে ধাবমান শিশুকে ধরিবার ভাণ করিতেছে। স্ত্রীর মুখে কৌতুক পূর্ণ উজ্জ্বল হাস্যরেখা কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! কই, স্ত্রী যে এত সুন্দর, তা তো কখনও দেখি নাই! এত সৌন্দর্য্য একদিনও তো আমার চোখে পড়ে নাই! এই বালকের জন্যই বুঝি তার এত সুন্দরতা, এত আনন্দ ফুটে বের হয়েছে!

এই কৌতুকের সম্পূর্ণ অংশভাগী হইবার জন্য আমার মন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি অগ্রসর হইয়া বলিলাম,—"বাঃ! কি সুন্দর দিন!" কিন্তু আমাকে দেখিয়াই যেন তাহাদের সমস্ত হাসি মিলাইয়া গেল। স্ত্রী তাড়াতাড়ি বালকটীকে লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেইদিন হইতে তাহাদের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে কেমন বিরক্তির ভাব জন্মিল। তাহাদের হাসির রাজ্য হইতে আমার এ নিষ্ঠুর নির্ব্বাসন কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বালকটী যখন "মা" মা" শব্দে একান্ত আগ্রহে আমার কোল হইতে মুক্ত হইয়া স্ত্রীর গলা জড়িয়ে ধরিত, তখন আমার মন কেমন তিক্ত হইয়া উঠিত। তাহাদের এই সুন্দর হাসির রাজ্য লইয়া স্ত্রী যেন ক্রমেই আমার নিকট সুদূর হইয়া উঠিল। এই বালকের হৃদয়-রাজ্য অতিক্রম ক'রে তাহাকে লাভ করা একান্তই অসম্ভব। যেন বলিতে ইচ্ছা হইল,—"যে ভালবাসা একান্ত আমারই প্রাপ্য, তাহা তুমি অন্যকে দিয়া ভাল কর নাই।"

আমার হৃদয়ের শূন্যতা ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছিল। কিছু দিন দেশ ভ্রমণে যাইবার মনস্থ করিলাম। স্ত্রীকে বলিলাম। বিদায়ের পূর্ব্বে স্ত্রী বলিল,—"আমাদের খোকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইবে না?"

এই বলিয়া স্ত্রী খোকাকে আনিয়া আমার বুকে দিল। খোকা "বাবা বাবা" শব্দে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, কিন্তু কিয়ৎপরেই কাঁদিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি স্ত্রী আসিয়া খোকাকে উদ্ধার করিল।

এই "বাবা" শব্দে মনের মধ্যে কেমন একটা স্পন্দন উত্থিত

হইতেছিল! এই সুমধুর সম্ভাষণ তো স্ত্রীরই শেখান বাক্য। ইচ্ছা হইতেছিল, আমাদের আট বৎসরের বিচ্ছেদের ইতিহাস সেই মুহূর্ত্তে এক চুম্বনে মুছিয়া ফেলি; পারিলাম না। কম্পিতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

কয়েক মাস পরে বন্ধুর পত্রে বাড়ীর দুরবস্থার সংবাদ অবগত হইয়া বাড়ী রওনা হইলাম। সেই শিশু-গ্রহণের দিন থেকে এক বৎসর পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছি, আবার কজলী-উৎসব ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া দেখি, বাড়ীতে যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা রাজত্ব করিয়া বসিয়াছে। সব নিস্তব্ধ! আমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেই স্ত্রী দৌড়িয়া আসিয়া আমার পা জড়িয়ে ধ'রে, বলিল,—"নলিন বুঝি বাঁচে না!"

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া নলিনের কক্ষে গিয়া দেখি, স্ত্রীর অনুমান সত্য—আসন্ন মৃত্যুর ছায়া ক্ষুদ্র বালককে যেন ঘিরে রয়েছে। দুইজনে সেই শীর্ণ বালকের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। তাহার বিশীর্ণ মুখচ্ছবি যেন আমাকে বলিতেছে—"ভালবাস, ভালবাস।" আমাদের দু'জনার চক্ষু অশ্রু-প্রবাহে ভাসিতেছিল, দু'জনের হৃদয়ে এক বেদনা উচ্ছ্বসিত হইতেছিল—"ভালবাস, ভালবাস!"

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে নলিনের আত্মা মরধাম পরিত্যাগ করিল। দুজনে ধরাধরি করিয়া বাগানের এক পার্শ্বে তাহাকে সমাহিত করিলাম!

সব ফুরাইল! শুধু সেই "বাবা"শব্দটুকু যেন সমস্ত আকাশ ভরিয়া রহিল!

বর্ষার সুদীর্ঘ বারিধারা যেমন করিয়া শূন্য আকাশ অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভরিয়া দিয়া তৃষিত ধরণীর সঙ্গে মিলন সংঘটিত করিয়া দেয়, আমার বক্ষে স্ত্রীর অজস্র অশ্রুপ্রবাহও তেমনি উভয়ের তৃষিত আত্মার নিবিড় মিলন সংঘটিত করিয়া দিল। স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল,—"তুমি কি তাহাকে ভালবাস্‌তে?

"প্রিয়ে—প্রিয়তমে, সে সত্যই আমাদিগকে ভালবাসা শিক্ষা দিতে এসেছিল"—আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

তখন কজলীর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল,—

"ঝর ঝর বাদল বরষৈ,
সোহিকে মিলন আজ হোই।"

নবকুটীর
২৫শে ভাদ্র
১৩২০ বঙ্গাব্দ।

বিজয়ী

মোগল গৌরব তখন প্রায় অস্তমিত। তুঙ্গীভূত রত্নমাণিক্যময় "দিবানের দীপ—তক্তভাউস", নাদিরের করায়ত্ত; সঙ্গে সঙ্গে মোগল গৌরবের জ্যোতিও বুঝি চিরতরে নির্ব্বাপিত হইতেছিল। দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি একে একে মোগল রাজসিংহাসন হইতে খসিয়া পড়িতেছিল। দুর্ভাগ্যের কাল নিশীথিনীর শিশির পাতের সূত্রপাত বুঝি বাদশাহের বিস্তীর্ণ প্রাসাদের মর্ম্মর হর্ম্ম্যতলেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল! বড় দুঃখে এক বাদশাহ গাহিয়াছিলেন,—"যব হাম গুজারী, দুনিয়া গুজারী", বিশ্বের বোধ হয় ইহা চিরন্তন প্রথা,—হাম এবং দুনিয়া এক সূত্রে বাঁধা।

ভূস্বর্গ—মোগল বাদশাহগণের বিলাসপুরী কাশ্মীরও বুঝি মোগলের হস্তচ্যুত হয়। একদিন কাশ্মীরের পাঠানগণ উত্তেজিত হইয়া মোগল সুবাদারের প্রাসাদ আক্রমণ করিল; ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য ভিতর হইতে দু'একবার বন্দুকের আওয়াজ হইল, কিন্তু ফল ফলিল বিপরীত; বরং পাঠানগণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া প্রাসাদের রক্ষীবর্গকে পরাস্ত করিয়া প্রাসাদ অধিকার করিয়া ফেলিল। পাঠানদের বিজয়নিশান প্রাসাদের সমুচ্চ শিরে উড়িতে লাগিল।

চতুর্দ্দিক হইতে মোগল সৈন্য আসিয়া সেই প্রাসাদে পুনরধিকারের চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য কিছুদূর হটিয়া গিয়া ঝিলমের তীরবর্ত্তী একটী উচ্চ স্থানের উপর চারিটী কামান সংস্থাপন করিয়া মুহুর্মুহু নিম্নস্থ নগরের উপর অনল বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে পাঠানগণ বড়ই বিব্রত হইল; তাহাদের কোন

কামান বা ভাল বন্দুক ছিল না, কাজেই প্রচণ্ড তোপের মুখে নগরীর সমস্ত অধিবাসীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

পাঠানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া পাহাড়ের স্থানে স্থানে বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

হাজার হাজার পাঠান যুবক ও বালক জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছিল।

* * * *

পাষাণ সোপান বাহিয়া একটী অনিন্দ্যসুন্দরী ঝরণা নিপুণা নর্ত্তকীর মত সহজ তরল নৃত্যের সুললিত গতিতে নৃত্য করিতে করিতে স্থির ঝিলমের জলে অবগাহনে নামিয়াছে, এবং কৌতুকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। উভয়েই সুন্দর,—সুন্দর মিলন, চতুর্দ্দিকের তরুলতা বন উপবন ফুলে ফুলময়; বনে বনে পিক-কাকলী; দীর্ঘ দীর্ঘ চিনার বৃক্ষের ছায়া ঝিলমের জল অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে; চতুর্দ্দিকে আকাশের বুকে সমুন্নত পীরপাঞ্জল পর্ব্বতমালার শুভ্র বরফ-মণ্ডিত শৃঙ্গগুলিতে রবির সুবর্ণ-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া নানা বিচিত্র সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করিতেছিল,—সৌরভে, শোভায়, ঝঙ্কারে, আলো ছায়ায় স্থানটী মনোরম!

ঝরণার সম্মুখভাগে ঝিলমবক্ষে একটী প্রকাণ্ড মোগল-প্রাসাদ—শ্রীভ্রষ্ট; যেন বেদনার একখানি তপ্ত কঠোর স্মৃতি।

চিনার বৃক্ষমূলে উপলখণ্ডে বসিয়া একটী বালিকা পা দোলাইতেছিল; তাহার উন্মুক্ত পদতল ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, তাহাতে রাস্তার সাদা ধূলির নিবিড় সখ্যই পরিলক্ষিত হইতেছিল। বালিকা দরিদ্রা; তাহার পোষাক পরিচ্ছদাদিও তদনুরূপ; কিন্তু সুন্দর মুখমণ্ডল, ঘন কুঞ্চিত কেশপাশ, এবং সর্ব্বোপরি নিষ্ঠুর

রহস্যকারী হাসিতে তাহার ক্ষুদ্র জগতের অনেকে তাহার বশীভূত ছিল; এবং তদ্দ্বারা সে লোককে আনন্দ ও বেদনা বিতরণ করিতে পারিত। আনন্দ—তাহার হাস্য পরিহাসের দ্বারা; বেদনা—তাহার উত্তপ্ত অবজ্ঞা দ্বারা।

বালিকা অদূরে আর একটী উপলখণ্ডে উপবিষ্ট একটী বালকের সহিত রহস্য করিতেছিল। বালকের নাম হারুণ; সে বাঁশী বাজাইতে ও গান গাইতে বড় দক্ষ; কিন্তু তার প্রধান দোষ—সে খঞ্জ। তাহার দুঃখের নিষ্ঠুর উপমাস্বরূপ সকলে তাহাকে "তিন-পো" বলিয়া ডাকিত। কারণ, তাহাকে চলিবার সময় একটা কাঠের লাঠি বগলের তলে লইতে হইত।

হারুণ হতাশাবিমিশ্রিত আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়াছিল; সে জানিত, বালিকা সেলিনার হৃদয়-রাজ্যের বিজয়ী যুবক কাসেম যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলেই তাহাকে বিদায় লইতে হইবে। বালিকা হারুণের একান্ত প্রাণপূর্ণ ভালবাসায় কেবল মাত্র কৌতুক অনুভব করিবার নিমিত্তই কাসেমের অনুপস্থিতিতে তাহার সহিত রহস্য করিত।

মুগ্ধ ভক্ত,—আশা নিরাশায় তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল।

সেলিনা হারুণের আগ্রহপূর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বিজয়ী কাসেম; এখন সে যুদ্ধে পাঠান-গৌরব রক্ষা করিতেছে। হারুণ, তুমি সেখানে যাওনা কেন? তোমার মোটেই সাহস নাই!"—সেলিনার হাসিতে ও কথায় নিষ্ঠুর কৌতুকের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"সেলিনা, তুমি জান—আমি কেন যাই না!"

"হা আমি জানি। তুমি, বাঁশী, গান, স্ত্রীলোকের মুখ ও পায়-

আমার কবিত্বই ভালবাস। তুমি ভয় পাও—এই হচ্ছে আসল কথা।” সেলিনা নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া এই কথাগুলি বলিল।

হারুণের মুখের রক্তস্রোত উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তবু সে মৃদুস্বরে বলিল,—“সেলিনা, তুমি আমাকে রাগাইবার জন্যই এই কথাগুলি বল। তোমার মত দু’একজন স্ত্রীলোকের মুখ আমি ভালবাসি,—অস্বীকার করি না, কিন্তু সেলিনা, আমিও মরিতে জানি। মোগলদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য আমিও মরিতে প্রস্তুত। কি করি—অকর্ম্মণ্য!”

“মরিতে প্রস্তুত—সত্য! কথায় বলা খুব সহজ হারুণ, কিন্তু কাসেম তাহা কাজে দেখিয়েছে।”

হারুণ একদৃষ্টে সেলিনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাগে তাহার মুখ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত দেখাইতেছিল।

একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা ও রুদ্ররাগের প্রখর জ্যোতিতে চক্ষু দুটী জ্বলিতেছিল। তীব্র স্বরে হারুণ বলিল,—“কাসেম যাহা করিতে ভয় পায় সেলিনা, আমি তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি। তোমার কি অন্যায়! তুমি সকল বিষয়েই কাসেমকে বড় মনে কর। তুমি বল এখন, আমি এখনই গিয়ে মোগলের কামানের মুখে বুক পেতে দি’।”

হারুণের কথায়—এমন তীব্র ও একান্ত আগ্রহপূর্ণ বাক্যে, সেলিনার হৃদয়ে সামান্য সহানুভূতির ভাব উদ্রেক করিল; কিন্তু তখনই সে চাহিয়া দেখিল, কাসেম আসিতেছে। তাড়াতাড়ি সেলিনা দৌড়াইয়া সেদিকে গেল। হারুণও অতি কষ্টে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

সেলিনা কাসেমের নিকট গিয়া একটী উপলখণ্ডে বসিয়া পা

দোলাইতে দোলাইতে কাসেমকে বলিল,—"তিন-পৌ এতক্ষণ বলিতেছিল, তুমি নাকি ভীরু!"

খঞ্জ হারুণ তাড়াতাড়ি সেইখানে আসিয়া বলিল,—"না, আমি এ কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি,—যাহা কাসেম করিতে সাহসী হয় না, আমি তাহা করিতে পারি।"

সেলিনা বলিল;—"শোন কাসেম, সে নাকি তোমা অপেক্ষাও সাহসী!"

কাসেম উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"আমি তোমার মাথাটা ভেঙ্গে দিব, নচ্ছার তিন-পৌ!"

"এই রকমই তো তোমার বীরত্ব! আমি এখনও বল্‌ছি, তুমি যাহা করতে সাহস কর না, আমি সেলিনার জন্য তাহা করিতে পারি।"—হারুণ উত্তেজিত স্বরে এই কথাগুলি বলিল।

কাসেম উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"ইঃ! শুনি, তুমি কি পার!"

হারুণ। আচ্ছা, তুমিও তো সেলিনাকে ভালবাস ব'লে থাক। এস আমার সঙ্গে, ঐ পীরপাঞ্জলের চূড়ায় উঠি। সেলিনা যখন ইঙ্গিত করবে তখন আমরা ঝিলম নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বো—দেখি কে পারে! এস, নইলে আমি তোমাকে ভীরু বল্‌ছি।

হারুণ সেলিনার পার্শ্বে গিয়া গর্ব্বের সহিত দাঁড়াইল এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান করিতে লাগিল।

যোদ্ধা অগ্রসর হইল না। তাহার মুখে একটা বিষণ্ণতার হাসিও ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল,—"বাঃ! তা'হলে একটা বেশ বোকার খেলা হয়। না, আমি এই রকম নির্ব্বোধের আমোদে যাই না। বীরত্ব কিছু থাকে তো এসনা আমার সঙ্গে—তরোয়াল যুদ্ধে!"

"তবে আমি বলি তুমি ভীরু"—এই ব'লে বিষণ্ণ ও গম্ভীর ভাবে হারুণ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

কাসেম তৎক্ষণাৎই দৌড়ে গিয়ে হারুণের পৃষ্ঠদেশে খুব এক চোট প্রহার বসিয়ে দিত, কিন্তু সেলিনার ইঙ্গিতে সে সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যা'হোক হারুণকে লইয়া সেলিনা সময় সময় রহস্যও তো করিতে পারে!

সেখান থেকে ফিরে এসে হারুণের মনে হইতে লাগিল, রাগে যেন তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে! হায়! ঈশ্বর তাহাকে কেন এই রকম খঞ্জ করিলেন—কোন্ পাপে তাহার এ কঠোর শাস্তি! ভাইভগ্নী—তাহারা পর্য্যন্ত তাহার জন্য অপমান বোধ করে। সে প্রাণের সহিত যাকে ভালবাসে, সেই সেলিনা—সেও তাহাকে ভীরু মনে করে এবং কাসেমের সাহসের প্রশংসা করে। হারুণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"কই, আজ তো আমি সাহসের পরিচয় দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কাসেম—কুকুরটাই তো সাহসী হইল না! কাসেম বলে, ইহা নির্ব্বোধের খেলা। তবে সত্য সত্যই কি যুদ্ধে না গেলে বীরত্ব দেখাইবার উপায় নাই? আমি যুদ্ধে যাই না বলে সেলিনা পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করে। এই ঝরণার শীতল জলে ডুবিয়া কেন সমস্ত যন্ত্রণা চিরতরে শান্ত করিয়া দেই না; তাহা হইলে সংসারের কোন বিদ্রূপ আমাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন বোধ হয় সেলিনাও আমার জন্য দুঃখ ক'রে একবিন্দু অশ্রুপাত করবে।"

হঠাৎ তাহার মনে হইল,—"তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলেই, তো ভাল হয়। তবে কাসেমকেও কেন বলি না, 'তুমি তো বড় সাহসী, এস যুদ্ধক্ষেত্রেই কামানের সম্মুখে গিয়া

যুদ্ধ করি।' কিন্তু কাসেম তাহা করিবে কেন? কাসেম জানে, সেলিনা তাহাকে ভালবাসে। কাজেই তাহার পক্ষে জীবন বিসর্জ্জন, তাঁহার পরিতৃপ্ত আশার সমাধি বই কিছুই নহে,—তাহার তো কোন লাভ নাই। সেলিনা তো তাহারই। কিন্তু হারুণের পক্ষে উভয়ই শূন্য! জীবন যেমন তাহার আশাশূন্য- মৃত্যুও তাহার পক্ষে তদনুরূপ!

সে ভাবিতে লাগিল, কি ভাবে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলে সে প্রকৃত লাভবান হইতে পারে! তবে কি খঞ্জ বালকের পক্ষে এমন কিছুই নাই, যাহাতে সে গৌরবান্বিত হইতে পারে? সে এমন কি মহৎকার্য্য করিয়া যাইতে পারে, যদ্দ্বারা সে নিজের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে পারে! সে শুনিয়াছিল, প্রকৃত আত্মত্যাগ দ্বারা মানুষ জগতে অমরত্ব লাভ করে।

ক্রমে তাহার মনের দুর্ব্বলতা অপসারিত হইয়া প্রকৃত বীরত্বের ভাব জাগিতে লাগিল। তাহার মনে যেন বীরত্বের একটা সচেতন মূর্ত্তি ক্রমেই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল—কি করিয়া সে অমর হইতে পারে। তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি এই যুদ্ধে সে কোন প্রকারে মোগল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া দিতে পারে, তবে লোকে নিশ্চয়ই তাহাকে প্রকৃত সম্মান করিবে। কিন্তু ইহা অসম্ভব কার্য্য!

তখন মোগলের কামানের গুলিবর্ষণ কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত হইয়াছিল। হারুণ মনে মনে নানা চিন্তা করিতে করিতে যুদ্ধ-স্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বে আসন্নমৃত্যু-শয্যাশায়ী একটী লোকের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে পৌঁছিতেই সে থামিল। শুনিতে পাইল, যুদ্ধে আহত লোকটী নিকটবর্ত্তী সঙ্গীকে

বলিতেছে,—"সমস্ত ধ্বংস হবে। যদি আজ কেহ এই কামান কয়টা কোনো ক্রমে ধ্বংস করিয়া না দিতে পারে, তবে আর রক্ষা নাই, সব ধ্বংস হবে!"

তখন অপরাহ্ন। সেখান হইতে মোগলের অনলবর্ষী কামানের মুখগুলি দেখা যাইতেছিল; রৌদ্র লাগিয়া সেগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। গোলাগুলির স্তূপ কামানের পার্শ্বে সজ্জিত হইতেছিল। হারুণ আরো কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যে স্থান হইতে পাঠানেরা যুদ্ধ করিতেছিল, সেখানে গেল। ভীত পাঠানেরা কামানের সম্মুখে আত্ম-রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হারুণের তখন মনে হইল,—"আঃ! যদি কোন রকমে ঐ গুরুনাদী কামানের গর্জ্জন নিস্তব্ধ করিয়া দিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয় পাঠানেরা বিজয়ী হইত। যদি কোন রকমে তাহাদের বারুদের স্তূপে আগুন ধরাইয়া সমস্ত মোগল সেনা উড়াইয়া দিতে পারিতাম, তা'হলে পিতা মাতা পর্য্যন্ত আমার গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন! দেশের লোক আমার সম্মান করিত! কাসেমের মুখও তখন 'ভোতা' হইয়া যাইত! এমন কি সেলিনা পর্য্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আমার ভালবাসা প্রার্থনা করিত। কিন্তু কার্য্যটী একান্তই অসম্ভব!"

হারুণ নগরীর একটা পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া কেবল এই কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্কে ও শরীরে রক্তস্রোত কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনের মধ্যে বীরত্বের ভাব কেমন উত্তেজিত ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঐ চিন্তার মধ্যে ক্রমেই ডুবিয়া পড়িতেছিল।

হারুণ একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সূত্রধরের যন্ত্রাদি

পড়িয়া রহিয়াছে। সেগুলি হইতে সে একটি হাতুরি ও লৌহ বিদ্ধ করিবার যন্ত্র তুলিয়া লইল। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে কি একটা ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। সে শুনিয়াছিল, কি করিয়া কামানের গায় ছিদ্র করিয়া দিতে পারিলে, তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে সঙ্কল্প হইল,—রাত্রির অন্ধকারে কোন প্রকারে কামানগুলির নিকট গিয়া সেগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া আসিবে। সে হাতুরি ও লৌহ-বিদ্ধক যন্ত্রখানি পকেটে লইল। তাহার মনে হইল, কামানের নিকটে নিশ্চয়ই পাহারা থাকিবে; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সে অনায়াসে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে।

সে উৎকণ্ঠা সহকারে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। পুনরায় কামান গর্জ্জন আরম্ভ হইল। প্রতিবারের ধ্বনিতে শত শত পাঠানের সকরুণ চীৎকার উত্থিত হইতেছিল। বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া পাঠানের বন্দুক গর্জ্জন করিতেছিল, কিন্তু কামানের প্রতি-যোগিতায় তাহার ধ্বনি অতি ক্ষীণ শোনা যাইতেছিল।

রাত্রি ১১টা কি ১২টার সময় কামান গর্জ্জন পুনরায় থামিয়া গেল। সব নিস্তব্ধ! এত গাঢ় অন্ধকার যে, স্বীয় হস্ত পদাদি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বালক হারুণ তখন ধীরে ধীরে কামানের দিকে অগ্রসর হইল। অতি সন্তর্পণে সে পাহাড় উত্তরণ করিতে লাগিল। চলিবার সময় কোন ক্ষুদ্র শিলা স্থানচ্যুত হইয়া সামান্য শব্দ হইলেই সে প্রহরী দ্বারা ধৃত হইবে। কাজেই অতি সন্তর্পণে ও ভয়ে চলিতেছিল। বহুক্ষণ প্রাণপণ পরিশ্রমে সে কামানের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। হারুণ যে স্থানে পৌঁছিয়াছিল, সে স্থান হইতে কামান-মঞ্চে উঠিতে একটা মাত্র পথ। দুই প্রহরী সে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, নিশ্চয়ই

এখানেও কোন প্রহরী আছে। সে এক উপায় উদ্ভাবন করিল, পদতল হইতে একখণ্ড শিলা কুড়াইয়া অন্য দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিল। শিলাখণ্ডের দিকে প্রহরী আলো লইয়া অগ্রসর হইল। হারুণ নিরাপদে প্রহরীর রাস্তা দিয়া একেবারে কামান-মঞ্চের উপর উঠিল। কামানের নীচের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সে বসিয়া পড়িল। বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কামানের উপর উঠিয়া অস্ত্রগুলি বাহির করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। হাতের মুঠ লৌহবিদ্ধক যন্ত্রের উপর রাখিয়া হাতুড়ি দ্বারা আস্তে আস্তে আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে কোন শব্দ উৎপন্ন হইল না। কিছুক্ষণের চেষ্টায়ই একটী কামানের টিপের কাছে ছিদ্র করিয়া ফেলিল। তারপর সেই স্থান হইতে নামিয়া আর একটী কামানের উপর উঠিয়া তাহার কার্য্যও সম্পন্ন করিল। তৃতীয় কামানটীও এই ভাবে ছিদ্র করিয়া চতুর্থ কামানের উপর উঠিয়া লৌহবিদ্ধক যন্ত্রটী বসাইয়া তাহার উপর হাত রাখিয়া হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। কার্য্য প্রায় শেষ,—আর এক আঘাতেই তাহার সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। কি আনন্দ! আনন্দে তাহার সর্ব্বশরীর ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল! শেষ আঘাত দিবার জন্য হাতুড়ি তুলিল—এই শেষ; কিন্তু তাহা শিকের আগায় না লাগিয়া কামানের গায়ে লাগিয়া ঘণ্টার মত বাজিয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক সৈন্যের পদধ্বনি দ্রুত সেই দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তখন হারুণের সমস্ত সতর্ক আত্ম-রক্ষার সঙ্কল্প অন্তর্হিত হইয়াছে। মনের মধ্যে বীরত্বের দীপ্ত আলোক স্ফুরিত হইল, এবং কার্য্য সম্পাদনের আত্মপ্রসাদে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল, সে জলন্ত উৎসাহে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"জয় পাঠানের জয়।"

অবিলম্বে তিনটী বন্দুকের একত্র প্রহার তাহাকে নীরব করিয়া দিল। সে মাটীতে পড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ সেনাপতি তাহার অঙ্গে পদাঘাত করিয়া বলিল,—"সয়তান-টাকে ছুঁড়ে পাহাড়ের নীচে ফেলে দেও।" সৈন্যগণ উৎসাহ সহকারে তাহাই করিল। তারপর সেনাপতি একে একে সমস্ত কামানগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"আঃ! সয়তান সমস্তই নষ্ট করিয়া দিয়াছে!"

প্রভাতের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গম্ভীর গর্জ্জনকারীগণ সকলেই নীরব ছিল। পাঠানেরা এত সহজে মোগলদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেরাই বিস্মিত হইল!

মোগলের সমস্তই পাঠানের করায়ত্ত হইল।

* * * *

সেলিনা পুনরায় সেই উপলখণ্ডে বসিয়া সেইরূপ পা দোলাইতে-ছিল এবং কাসেম তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধস্বরে নিজের অতুল বীরত্বের বর্ণনা করিতেছিল; এবং সেখান হইতে কিয়দ্দূরে পাষাণ-স্তূপের মধ্যে হারুণ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল,—নিন্দা বা প্রশংসা-বাক্যের কিছুতেই সে কর্ণপাত করিল না!

নবকুটীর
২৬এ অগ্রহায়ণ,
১৩২০ বঙ্গাব্দ।

কেশগুচ্ছ

খোবানী, মনক্কা, আঙুর, সেউ প্রভৃতি মেবা লইয়া উটের পিঠে চড়িয়া বেলুচীস্থানের মরুপ্রান্তর পার হইয়া ও দুর্গম গিরিগাত্র বাহিয়া জালাল রুমা প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষে আসে; করাচি ও সিন্ধুনদের উপকূলস্থানগুলিতে তাহার বাণিজ্য-প্রসার। এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রতি বৎসর সে স্বদেশে ফিরিয়া যায়। ভারতের শস্যশ্যামল স্থান অপেক্ষা বেলুচীস্থানের বন্ধুর পর্ব্বতসঙ্কুল বালুকাময় প্রদেশ তাহার সমধিক প্রিয়। পর্ব্বতবুকে "মুলা" নদীর তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম "নীহারা"—তাহার জন্মভুমি, তাহার চক্ষে নন্দন-কানন সদৃশ ছিল।

জালাল রুমা প্রতি বৎসরই করাচিতে আসিয়া খুসনারা নাম্নী এক দরিদ্রা অনাথা স্ত্রীলোকের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিত, এবং বিনিময়ে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় একমুষ্টি অর্থ ঐ ইরাণী মহিলার করায়ত্ত করিয়া আসিত। ইরাণী ইহা পাইয়া যথেষ্ট লাভ মনে করিত, কাজেই তাহার অতিথির প্রতি যত্নস্নেহের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। দরিদ্রা ইরাণী তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গৃহখানি অতিথির বাসের জন্য প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার অশন ও পরিচর্য্যা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ মনে করিত; বিনিময়ে অর্থমুষ্টিও প্রাপ্ত হইত।

এই যত্ন ও স্নেহ যতই ঘনিষ্ঠতায় পরিপাক পাইতে লাগিল, জালাল রুমার গৃহ প্রত্যাগমনের সময় ইরাণী মহিলা তত বেশী শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। খুসনারার মনে হইত, এবার জালাল রুমা দেশে না গেলেই ভাল হইত। হাঁ! তাহা হইলে তাহার অধিক অর্থপ্রাপ্তির

সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহার মন পূর্ব্বের মতো অর্থের প্রতি তত আকৃষ্ট ছিল না, অর্থ অনাবশ্যক সম্পদের মতোই তাহার গৃহে জমিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে রবির আঁখিজ্যোতিরেখা যখন রুদ্ধ জানালার প্রান্ত গলাইয়া কুঙ্কুমকনককণস্রাবের মতো জালাল রুমার মুখে মাখাইয়া দিতেছিল, তখন খুসনারা আহার্য্য ও পানীয় লইয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইল। খুসনারা ভুলিয়া গিয়াছিল—কি জন্য সে সেই স্থানে আগমন করিয়াছে। সে মুগ্ধের মতো হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে পিয়াসী চকোরীর মতো কাহার সৌন্দর্য্য পান করিতেছিল! জালাল আহারের প্রতীক্ষায়ই বসিয়াছিল, সে বহুক্ষণ খুসনারাকে নিস্পন্দ অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল,—"খুসন, কি দেখিতেছ?"

খুসনের স্বপ্ন চকিতে ভাঙ্গিয়া গেল, সে লজ্জাবনতমুখী হইয়া কোন রকমে আহার্য্যের থালাখানা জালালের সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। সে সময় জালাল স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল,—"খুসন, কালই প্রাতে আমি দেশে যাত্রা করিব, এবার আমি তোমাকে বেশ অর্থ দিয়া যাইব, যেন তোমার বাকী ক'মাস কোন কষ্ট না হয়।"

খুসনারা সলজ্জ ভাবে বলিল,—"এবার কেন থেকেই যান না, এ দিকে কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখুন।"

জালাল মৃদু হাস্যে বলিল,—"না, বাড়ীতে সব রয়েছে, তাদের তো দেখতে হয়। এখানেই তো বছরের বেশী ভাগ থাকি।"

খুসনারা বিষণ্ণ ভাবে বলিল,—"প্রত্যেক বারই তো দেশে যান আমার জন্য তো আপনাদের দেশ থেকে কিছুই আনেন না।"

জালাল। এবার আনিব; বল, তোমার কি ভাল লাগে!

খুস। আপনার যা ভাল লাগে। আপনার দেশে কি আছে

আমি কি করে জানবো,—আপনার যা' সব চেয়ে ভাল লাগে, যা' দেখ্‌লে আপনি সব চেয়ে প্রীত হন, তাই আনবেন।

"তা' আনবো"—বলে পর দিন জালাল রুমা উটের পিঠে চড়িয়া দেশে যাত্রা করিল।

যতক্ষণ না সে চালগুজা ও পেস্তার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পার হইয়া দৃষ্টির বাহিরে গেল, ততক্ষণ খুসন এক দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বহুদিন পরে পুত্রকন্যা ও স্ত্রীর মধ্যে আসিয়া জালাল আনন্দে মত্ত হইল। বর্ষের সুদীর্ঘ আটমাসের স্মৃতি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে উদিত হইল না। এই আট মাস কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে, তদ্দ্বারা স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া সে সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

জালাল রুমার স্ত্রীর নাম মজিনা খাতুন; জালাল তাহাকে আদর করিয়া কখনো "গুলগুলাব," কখনো "হি-আসমান," কখনো "রঙ্গীণা বুল" বলিয়া ডাকিত; বাস্তবিকই তাহার চিত্ত-সৌন্দর্য্য গোলাপ ফুলের মত মনোহর, প্রেমিকা বুলবুলের মত সুধাপ্লাবী ও 'হি-আসমান' বা যূথিকা ফুলের মত নত নম্র ছিল। তাহার দেহ-সৌন্দর্য্যও চিত্তশ্রীর অনুরূপ মাধুর্য্যে পূর্ণ ছিল। জালাল রুমাও বলিষ্ঠ, সৌষ্ঠবপূর্ণ ও সুপুরুষ ছিল। তাহার বলিষ্ঠ দেহ যেমন কোন সময়ই কর্ম্মবিমুখ ছিল না, তাহার চিত্তও তেমনি স্নেহহীন ছিল না; সে সর্ব্বদা পরের উপকার করিয়া কৃতার্থ হইত। তাহার উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধ কপর্দ্দকও অন্যায় রূপে ব্যয়িত হইত না। এ হেন স্বামী পাইয়া মজিনা বিবি যেমন তৃপ্ত হইয়াছিল, এ হেন স্ত্রী পাইয়া জালাল রুমাও তেমনি কৃতার্থ হইয়াছিল।

আবার মেবা লইয়া জালাল রুমার ভারতবর্ষে যাইবার সময় হইল, সে ভারে ভারে মেবা সব বোঝাই করিয়া লইল। কাজেই সে সময় তাহার প্রবাসের আশ্রয়-কুটীর খানির স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইল, এবং তৎসঙ্গে প্রবাসের সেই আশ্রয়দাত্রী অতিথিবৎসলা ইরাণী মহিলাকেও মনে পড়িল। ইরাণী মহিলার সেই অনুরোধের কথাও জালাল রুমা বিস্মৃত হয় নাই। কাজেই সে ভাবিতে লাগিল,—"কি জিনিষ নিলে প্রকৃত পক্ষে ইরাণীর উপযুক্ত হইবে! সে বলিয়াছিল, আমার যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে তাহাই লইয়া যাইতে।"

জালাল স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলিল,—"আমি তো অনেক দিনের জন্য বিদেশে থাক্‌বো, তোমার একটা প্রিয় দ্রব্য আমাকে দেও।"

মজিনা সহাস্যে উত্তর করিল,—"আমার আবার কি আছে, সকলি তো তোমার পদতলে বিক্রীত। আমার প্রিয় দ্রব্য তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই।"

তখন জালাল বলিল,—"আচ্ছা, ঐ যে তোমার মাথার সামনে ফণা ধ'রে এক গুচ্ছ কেশ রয়েছে, তাই আমাকে দেও।"

মজিনা তৎক্ষণাৎ কাঁচি লইয়া নিজের কুঞ্চিত কেশগুচ্ছটী কাটিয়া স্বামীর হস্তে অর্পণ করিল।

জালাল সেটী চুম্বন করিয়া নিজের ইজারের পকেটে রাখিল। তারপর স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া জালাল বিদায় গ্রহণ করিল।

মজিনা বিবি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গেল। যখন জালালের উট প্রান্তর পার হইয়া একটা পর্ব্বতের প্রত্যন্ত দেশে গিয়া পড়িল, তখন আর তাহাকে দেখা গেল না। মজিনা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল।

মরু পর্ব্বত প্রান্তর দেশ পার হইয়া জালাল রুমার উট করাচিতে আসিয়া পৌঁছিল। খুসনারা সযত্নে তাহার অভ্যর্থনা করিল।

পর দিবস খুসন জালাল রুমাকে বলিল,– "দেখি আমার জন্য কি প্রিয় দ্রব্য আনিয়াছেন?"

জালাল নিজের ইজারের পকেট হইতে সেই কেশগুচ্ছটি হস্তমুষ্টির মধ্যে রাখিয়া বলিল,—"বল দেখি কি আনিয়াছি!"

খুসনারার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি জালালের হস্ত ধরিয়া বলিল,—"দেখি দেখি—কি আনিয়াছেন!"

জালাল সহাস্যে বলিল,—"বলিতে পারিলে—"

খুসন হাসিয়া বলিল,—"আপনার প্রিয় দ্রব্য আমি কি করিয়া বলিব!"

"এই নেও" বলিয়া ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছটি জালাল খুসনের হাতে দিল!

খুসনারা এই কেশগুচ্ছ দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল, মনে করিল—"এ কি!"

জালাল খুসনের পূর্ব্ববৎ হর্ষ না দেখিয়া একটু বিমর্ষ হইল।

খুসনারা বলিল,—"এ কার—কোথা হইতে আনিলেন?"

জালাল রুমা হাস্য সহকারে বলিল,—"এ আমার প্রাণপ্রেয়সীর। তা'র চক্ষের উপর ফণা ধরে এই কেশগুচ্ছটি দুলতো, কি সুন্দর দেখাতো! তুমি যদি দেখতে, নিশ্চয় খুসী না হয়ে থাকতে পারতে না।"

খুসনারা হাসিতে খুব চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসি তাহার প্রাণের কি না, বলিতে পারি না।

খুসনারা সুন্দর কেশগুচ্ছটী লইল। কিন্তু ইহা তাহার শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিল। খুসনারা বুঝিতে পারিল,

জালাল তদীয় স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। ইহা যেন খুসনারার প্রাণে সহ্য হইল না। কাজেই এই কেশগুচ্ছটি—জালালের পূর্ব প্রণয়ের প্রেমনিদর্শনটুকু, তাহার জীবনের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া ছাড়িল না। এই কেশগুচ্ছটি যেন মূর্ত্তিমান বিরোধ-বাধার মতো তাহার প্রাণের মধ্যে আসন জুড়িয়া বসিল। এতদিন সে যে উচ্ছ্বসিত আনন্দ আবেগে মত্ত থাকিত, আজ যেন তাহাতে কি বাধা পড়িল। এখন তাহার প্রতি কর্ম্মের মধ্যেই যেন কি বাধা, কি অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল;—শয়নে স্বপনে ভ্রমণে উপবেশনে সর্ব্বত্র যেন বাধা। এই বিঘ্নের কোন কারণও সে সম্মুখে খুঁজিয়া পাইল না। পূর্ব্বে তো তাহার কার্য্যে এমন কোন বাধা উপস্থিত হইত না!

খুসনারা এবার অশেষবিধ যত্ন সহকারে অতিথির পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। খুসনারার আত্মীয়স্বজন কেহ ছিল না। বহু বৎসর পুর্ব্বে প্রথম যৌবনের সময় তাহার স্বামী লোকান্তরিত হইয়াছিল। অতিথিকে পাইয়া তাহার স্নেহপরিচর্য্যা যেন দিন দিন অধিকতর ভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অতিথির রোগে তাহার শয্যাপার্শ্বে কল্যাণীরূপে, সারা দিনমানের পরিশ্রমের পর অতিথির পার্শ্বে বসিয়া আহার প্রদানে, এবং মানব-জীবন যাপনের অশেষবিধ প্রয়োজনের একমাত্র পরামর্শদাত্রীরূপে খুসন অবস্থান করিত।

রোগে কাতর হইয়া একান্ত বিষণ্ণ চিত্তে জালাল যখন একখানি স্নেহ-করুণার মুখ খুঁজিত, তখন একমাত্র খুসনকেই দেখিতে পাইত! রোগসন্তাপকণ্টকিত দেহে একটু স্নেহস্পর্শ অনুভব করিতে যখন মন ব্যাকুল হইত, তখন একমাত্র খুসনের কোমল হস্তখানি তাহার দেহে অনুভব করিত। ক্রমে জালাল সে হস্তখানি যেন হৃদয়ের

অভ্যন্তরেও খুঁজিয়া পাইল। কাজেই জালাল এবং খুসনের আভ্যন্তরীণ দূরত্ব ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল।

এমন সময় আবার জালালের গৃহ প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইল। জালাল প্রবাসিনী স্নেহশীলার নিকট বিদায় লইতে গেল।

জালাল বলিল,—"স্নেহশীলা, আমি এবার দেশে যাত্রা করি।"

নিকটে একটা কপোত-দম্পতি চঞ্চু-চুম্বনে প্রেম জানাইতেছিল, তাহাদিগের দিকে চাহিয়া খুসন বলিল,—"আপনি চলে গেলে ত আমার সব শূন্য হয়ে যায়, আমার বড় একেলা মনে হয়।"

জালাল। আবার এই কয়েক মাস পরেই তো আসৃছি।

খুসন অধোমুখে বলিল,—"আচ্ছা, এবার আমাকে কেন আপনাদের দেশে লইয়া যান না!"

জালালের নিকট এ প্রস্তাব কেমন অসঙ্গত ঠেকিল! --এ ভিন্ন-দেশের প্রবাসিনী, সঙ্গে যাইতে চাহিতেছে! তবু এর স্নেহ তো অস্বীকার করা চলে না!

জালাল ভাবিয়া বলিল,—"তুমি অতো দূরদেশে কি করে যাবে, কত ভয়ঙ্কর স্থান দিয়া যেতে হয়! তুমি কি যেতে পারবে?"

খুসন দৃঢ় ভাবে বলিল,—"কেন পারবো না, খুব পারবো। নিয়ে যাবেন কি?"

জালাল অগত্যা বলিল,—"তবে চল।"

কিন্তু সে ভাবিতে লাগিল, "ইহাকে দেশে লইয়া গেলে স্ত্রীপুত্র ইহারা কি বলিবে, পাড়া-প্রতিবাসীই বা কি ভাবিবে! কিন্তু কি করিব, যখন বলিয়া ফেলিয়াছি তখন সঙ্গে লইতেই হইবে।"

তার পরদিবস এক উটের পিঠে চড়িয়া দুজনে বেলুচীস্থানের দিকে রওনা হইল। গৃহে পৌঁছিয়া জালাল সস্নেহে স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন দিল।

মজিনা জিজ্ঞাসা করিল,—"এ স্ত্রীলোকটী কে?"

জালাল এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। প্রবাসিনী যে তাহাকে এত স্নেহ যত্ন আদর করিয়াছে, কি বলিয়া পরিচয় দিলে তাহার সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত হয়, জালাল তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না; অবশেষে বলিল,—"এ আমার করাচির সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষী বন্ধু, ইহার কুটীরই আমার প্রবাসে আশ্রয়।"

মজিনা বলিল,—"দেশ ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছেড়ে ও এখানে আসিল কি প্রকারে?"

জালাল বলিল,—"ওর কেহ নাই, আমিই সঙ্গে আনিয়াছি।"

মজিনার মনে কেবলি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, "এ প্রবাসিনী এখানে কেন! এখানে তার প্রয়োজন? স্বামী তাহাকে একজন হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী কি ধৃষ্ঠা, যে সে অনায়াসে একজন পুরুষের সঙ্গে এত দূরদেশে চলিয়া আসিল? স্বামীর চরিত্রে সে কিছুতেই সন্দেহ করিতে পারিল না, তবুও তাহার মন কেমন অভিমান ঈর্ষায় দগ্ধ হইতে লাগিল।

মজিনা চিরকাল স্বামীর অনুগত, কিন্তু এবার সে স্বামীর প্রত্যেক কাজে কেমন বিরোধ উৎপাদন করিতে লাগিল। অন্যান্য বৎসর সে যেরূপ হাসিয়া নাচিয়া প্রাণ খুলিয়া স্বামীর সহিত প্রাণ মিশাইয়া কার্য্য করিত ও তাহার সেবাশুশ্রূষায় তৎপর থাকিত, এবার তাহার কিছুমাত্র পারিল না। কিসে যেন তাহার সমস্ত কার্য্যে বাধা

উৎপাদন করিতে লাগিল। মজিনার এই প্রকার ব্যবহারে জালাল প্রাণে প্রাণে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনেও অভিমান জন্মিল।

জালাল স্ত্রীর সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিলে সে যেন উপেক্ষার ভাবে সে স্থানে পরিত্যাগ করে।

এতদিন মজিনা স্বামী-প্রেমের একনিষ্ঠ সেবিকা ছিল, আজ এ কী হইল!

জালাল ভাবিল,—"তবে মজিনা কি নিরর্থক আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পাষণ্ড মনে করিল?"

মজিনার এই প্রকার ঔদাসীন ভাবের জন্য সম্যক রূপে তাহাকে দোষী করা যায় না। সে পূর্ব্বের ন্যায়ই স্বামীর সহিত সোহাগ ভালবাসা দেখাইতে চায়, কিন্তু কি যেন তাহার প্রতি কার্য্যে বাধা উৎপাদন করে; সে শেষে নিজের ব্যবহার উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হয়, কিন্তু সংশোধনের কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পায় না।

এই ভাবে চার মাস কাটিয়া গেল, জালালের করাচিতে ফিরিয়া আসিবার সময় হইল।

খোবানী, আঙুর, পেস্তা বোঝাই করিয়া জালাল ও খুসন এক উটের পিঠে চড়িয়া রওনা হইল। তাহা দেখিয়া মজিনা বলিল,—"খামিন! আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

এক উটে এতগুলি লোকের জায়গা হওয়া অসম্ভব, কাজেই স্ত্রীকে রাখিয়াই জালাল হিন্দুস্থান যাত্রা করিল।

মজিনা একদৃষ্টে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল, উটের পিঠে পড়িয়া খুসনের মাথা কেমনে জালালের বুকে হেলিয়া পড়িতেছে, আর জালালের দেহ খুসনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।

উট যখন আর দেখা গেল না, মজিনার দুই চক্ষু বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

জালাল রুমা খুসনকে লইয়া করাচিতে ফিরিয়া আসিল। এবার স্ত্রীর ঔদাসীন্য যেন তাহার স্নেহহীনতার পরিচয়পত্রস্বরূপ জালালের মনে হইল, এবং এ দিকে সেবারতা প্রবাসিনীর স্নেহটুকু যেন অমল আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জালাল স্ত্রীর প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, এখন খুসনের ব্যবহারের তুলনায় তাহা যেন বিদ্বেষে পরিণত হইল। সে এতদিন মনে করিত, এই প্রবাসিনী অর্থের প্রলোভনে বুঝি তাহাকে এত স্নেহযত্ন করিয়া থাকে। এত-দিন পরে সে স্নেহাতুর রমণীর সংগোপিত হৃদয়খানি আবিষ্কার করিয়া ফেলিল! তখন লোভাতুর রমণীর হৃদয়খানি বিচারবিচার্য্য সূত্রের কাছে মোটেই ধরা পড়িল না। জালাল ভাবিল,—কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা! কাজেই অতি সহজেই প্রবাসিনী খুসনের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল। এবার উভয়ের পরিচয়ের সীমা বন্ধুত্বের সংগোপন অবগুণ্ঠনকে উন্মুক্ত করিল এবং দুইজনে প্রেমালোকে পরস্পরের হৃদয়ের অসীম পরিসীমা দেখিতে পাইল। খুসন বিহনে নিজের হৃদয়ের একদিকটা যেন শূন্য বলিয়া জালালের মনে হইল। কাজেই অতি সহজেই খুসনের সৌভাগ্য উদিত হইল।

জালাল একদিন খুসনকে বলিল,—"এ ভাবে আর আমরা পরস্পর পৃথক থাকি কেন?"

অতি সহজেই খুসন এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। একদিন জালালের সহিত তাহার শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

সে বৎসর জালাল আর দেশে গেল না, করাচিতেই একখানি ছোট দোকান খুলিল।

দুই বৎসর জালাল স্বীয় গৃহের স্ত্রীপুত্রের কোন সংবাদ লইল না।

দুই বৎসর জালাল ও খুসন দাম্পত্য প্রণয়েই অতিবাহিত করিল জালাল কিছুদিনের জন্য দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই খুসন বিমর্ষ হয়; এমন কি, দুই একদিন আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, বহু সাধ্যসাধনা ও বিনয়ের পর খুসন শান্ত হয়।

খুসন এখন আর কোন সময়ই জালালকে বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিতে দেয় না, অন্তরে সর্ব্বদা শঙ্কিত চিন্তা, কি জানি জালাল দেশের লোকের সহিত কি পরামর্শ করে। খুসন নানাপ্রকারে জালালের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করে। জালাল এ সমস্ত শান্ত ধীর ভাবে সহ্য করিলেও মনে হয়,—"এই কি খুসনের ভালবাসা? কই মজিনার ভালবাসায় তো এমন বিষমাখা নিষ্ঠুরতা ছিলনা!" খুসন নানাপ্রকারে জালালকে ত্যক্ত ও বাক্যবাণে বিদ্ধ করিলেও জালাল নিতান্ত সহজ ভাবে তাহা সহ্য করিত। খুসনের প্ররোচনায় ও অধিক লাভের আশায় জালাল খুসনকে লইয়া বোম্বে যাইয়া দোকান খুলিল।

দুই বৎসর মজিনা জালালের কোন সংবাদই পাইল না। সে যাহা কল্পনা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে মনে করিয়া হৃদয়ে তীব্র নৈরাশ্য ও যাতনা অনুভব করিল। তাহার অন্তরে শোক ও অনুতাপ উপস্থিত হইল—হায়! সে সে-বৎসর স্বামীকে ভালরূপ যত্ন করে নাই এবং নানাপ্রকারে ঔদাসীন্য দ্বারা স্বামীর অন্তরে বেদনা দিয়াছে হয়তো, স্বামী সে জন্য বিরক্ত হইয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন অথবা সেই কুলটা তাহার স্বামীকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মজিনা করাচিতে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল, এবং তাহার যাহা কিছু সঙ্গতি ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা একটী উট ক্রয় করিল, এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া করাচি অভিমুখে যাত্রা করিল।

এক মাস কাল দুর্গম পথ অতিবাহনের পর পুত্রকন্যা লইয়া মজিনা করাচিতে আসিয়া পৌঁছিল। তখন মজিনা একপ্রকার নিঃসম্বল। সঙ্গে দু'টী শিশু পুত্রকন্যা, মজিনা বড় ভাবনায় পড়িল। সমস্ত সহর তন্ন তন্ন করিয়াও সে জালালের কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে একজন লোকের কাছে শুনিল, জালাল স্ত্রী লইয়া বোম্বে চলিয়া গিয়াছে। মজিনা বোম্বে যাইয়া জালালের অনুসন্ধান করাই স্থির করিল। স্বীয় পরিধেয় একখানা মাত্র বস্ত্র রাখিয়া গাত্রে যে সামান্য কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া মজিনা কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইল; তদ্দ্বারা শিশু পুত্রকন্যাদু'টীকে লইয়া বোম্বে যাত্রা করিল।

বোম্বে অত্যন্ত প্রকাণ্ড সহর। বোম্বে পৌঁছিয়া মজিনা হতাশ হইল, এত বড় সহরে সে কোথায় জালালের সন্ধান পাইবে!

মজিনা অতিকষ্টে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শিশু পুত্রকন্যাদুটীর কোন প্রকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। সন্তান দুটীকে খাওয়াইয়া মজিনার প্রায়ই আহার জুটিত না। মজিনা মনে করিল,—আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই শিশু সন্তানদু'টী কি প্রকারে বাঁচিবে!

দুইদিন তাহার আহার যোটে নাই, বুভুক্ষিত শিশু দুইটীও তাহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিল; বেদনায় মজিনার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

সারাদিন বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া মজিনা অবসন্ন দেহে অনাবৃত সমুদ্র-তীরের বালুকা-শয্যায় কাতর হইয়া শুইয়া পড়িল।

কত লোক সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ এই অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না।

সন্ধ্যার পর দরিদ্র বেশধারী একজন লোক আসিয়া তাহাদের সম্মুখে কিছু খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া গেল।

মজিনা পুত্রকন্যাদিগকে তাহা খাওয়াইতে লাগিল। মাকে খাইতে না দেখিয়া পুত্রকন্যারাও খাইতে অস্বীকৃত হইল, কাজেই তাহাদের মনরক্ষার্থ মজিনা দু'এক বার নিজের মুখে কিছু দিল।

খাওয়া শেষ হইলে সারাদিনের পরিশ্রান্ত শিশুদুইটী সেই অবস্থায়ই মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল।

মজিনা তখন কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"খোদা, আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও, আর এই শিশুদু'টীকে তুমি রক্ষা করিও।"

শোকে দুঃখে ক্লান্ত অবশ হইয়া মজিনা গাইতে লাগিল—

"মঁয় ভি মঁয় জান্‌ দিল্‌সে
আ পোরা বলা হারু হু
হ্যায় তেরি হিজির কা দিল্‌মে।"
খটক্‌তা খার হ্যায়
ইয়ে গুলে গুল্‌জার
তেরে গলেকী হার হুঁ॥"

এ গান শুনিয়া পথপার্শ্বে একজন পথিক যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। কান পাতিয়া সে গানের সবকথাগুলি শুনিল। তাহার মনে স্মৃতির আবেগে, কোন্ বিস্ময় যেন জাগিয়া উঠিল!

পথিক অগ্রসর হইয়া গায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

মজিনা বিস্ময়সহকারে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া উত্তর দিল—"আমি ভিখারিণী।"

পথিক পুনরায় অধিকতর বিস্ময়সহকারে প্রশ্ন করিল,—"কোন্ দেশ—কোন্ দেশে তোমার বাড়ি?"

ভিখারিণী উত্তর করিল—"বেলুচী—নিহ্মুরা।"

"অঁ্যা—অঁ্যা—তুমি কি মজিনা?"—পথিক উদ্ভ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ভিখারিণী অগ্রসর হইয়া পথিকের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"হাঁ, আমি তোমারই চরণাশ্রিতা দাসী মজিনা।"

পথিক আর কেহই নহে, স্বয়ং জালাল। জালাল তৎক্ষণাৎ মজিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং অজস্র চুম্বনে তাহার মুখ ভরিয়া দিল।

অনেকক্ষণ অশ্রুবর্ষণের পর জালাল বলিল,—"মজিনা, গৃহে চল।"

মজিনা সাশ্রুনয়নে বলিল,—"স্বামিন্ এই পুত্রকন্যা দু'টীকে লইয়া যাও, তোমার সুখের জীবনে আমি কণ্টক হইব না। তুমি এ দু'টীকে প্রতিপালন করিও,—এই প্রার্থনা; আর আমার অন্য কিছু আকাজ্ক্ষা নাই। ক্ষমা করিও—বিদায় দেও।"

জালাল মজিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"মজিনা, মজিনা, তুমি এ কী বলিতেছ! তুমি কি এই অধম স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিবে না! আমি তোমাকে যে ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়াছি, তাহা ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া কি আমাকে শাস্তিপ্রদানেও বিরত থাকিবে! কিন্তু তোমার বিরহ-শাস্তি অসহ্য!—তুমি যে দেবী, তুমি আমাকে অত গুরুতর শাস্তি দিও না,—চল এখন গৃহে।"

মজিনা গদ্গদ কণ্ঠে বলিল,—"না স্বামিন্, আমি গেলে খুসনের কষ্ট হবে। তুমি তাহাকে লইয়া সুখী হও। আমাকে বিদায় দেও, জন্মজন্মান্তরে আবার মিলন হবে।"

জালাল অশ্রু-আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—"মজিনা, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই! তুমি পরিত্যাগ করিলে আমার জীবন যে দুর্বহ হয়ে উঠবে!"

মজিনা বলিল,—"আচ্ছা চল এখন, যাহার ধন তাহাকে বুঝাইয়া আমি বিদায় লইব।"

জালাল মজিনা ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া গৃহে আসিল; ইহাদিগকে দেখিয়াই খুসন অন্য কক্ষে যাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিল।

জালালের শত সাধ্যসাধনায়ও আর দ্বার খুলিল না।

পরদিন প্রভাতে মজিনা খুসনের দরজায় গিয়া আঘাত করিল,—"বোন, বোন, দরজা খোল, স্বামীর উপর কি এত অভিমান করে থাকতে আছে! তোর স্বামী চিরকাল তোরই থাকিবে, মিছা কেন এই অভিমান করিস!"

অনেক বেলা হইল, তবু খুসন দরজা খুলিল না। অগত্যা জালাল গৃহদ্বার অন্য উপায়ে উন্মোচন করিয়া দেখিল,—শাণিত ছুরিকা বুকে বিদ্ধ করিয়া গতজীবন হইয়া মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে---খুসন।

মজিনা খুসনের মাথা বুকে লইয়া অনেক কাঁদিল—"হায়, তুই এই পাপ কেন করিলি! আমি কি তোর জীবনসর্ব্বস্ব লইতে আসিয়াছিলাম!—সে যে তোরই একমাত্র ছিল; আমি যে তোকেই সব দিতে আসিয়াছি! এতই কি তোর অভিমান, দুই দণ্ডের বিচ্ছেদ তোর সহ্য হল না!"

জালাল খুসনের জন্য দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। তারপর যথাবিধি খুসনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া একটী চমৎকার গোরস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিল।

খুসনের মৃতদেহের পার্শ্বে একটী কৌটায় একগুচ্ছ কেশ পাওয়া গিয়াছিল।

কেশগুচ্ছটি লইয়া জালাল মজিনা বিবির হাতে দিয়া বলিল,—"এই লও তোমার সেই কেশগুচ্ছ, তোমার পবিত্র প্রেমের স্মরণ-চিহ্ন

কলিকাতা।

পুষ্পমঞ্জরীর পরিণাম

প্রতিদিন অরুণ প্রভাতের জ্যোতি একটু একটু অপহরণ করিয়া যখন বাগানের ফলগুলি ক্রমাগতই লাল হইয়া উঠিতেছিল, তখন পুষ্পমঞ্জরীর দলগুলি শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া একে একে মাটিতে ঝরিয়া পড়িল। প্রজাপতিকে নৃত্য ও মধুপানে বিরত দেখিয়া বুলবুল বাগানে প্রবেশ করিল। ফুটন্ত মঞ্জরীর এহেন শুষ্ক ভগ্ন অবস্থা দেখিয়া সৌরভ-চোর বায়ু "হায় হায়" করিয়া উঠিল! মঞ্জরী বোঁটার অগ্রভাগে যে কি রাখিয়া গেল তাহা দেখিয়াছিল একমাত্র বুলবুল! বসন্তের ফুলসাজ ছিন্ন দেখিয়া দিকবালা ঘৃণায় মুখ ফিরাইল! কোকিল বিদায় চাহিল। কানন কাঁদিল! বসন্ত নীরবে বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া গেল। গ্রীষ্মের অসহ্য তাপে গাছের ডালে বসিয়া একমাত্র পাখী গাইতে লাগিল। কী করুণ সুধাবর্ষী সঙ্গীত!

বর্ষা নামিল। বসন্ত যাহাকে রূপ দিয়াছিল, গ্রীষ্মের উষ্ণ কঠোরতা ও বর্ষার অশ্রুপ্রবাহ তাহাকে সফল ও সরস করিয়া দিল। বাগান ফলে ফলে ভরিয়া গেল। বুলবুল ডালিমের গণ্ডে একটী প্রেম-চুম্বন দিতেই রসের ধারা প্রবাহিত হইল!

রূপের তৃষ্ণা রসে তৃপ্তি পাইল। যৌবনের সৌন্দর্য্য প্রেমের পরিণামে পূর্ণ হইল!

রূপ রস এমনি করিয়া জোড়ায় জোড়ায় মিলিয়া রহিয়াছে।

উভয়ের মিলনের নাম পূর্ণ-পরিণাম।